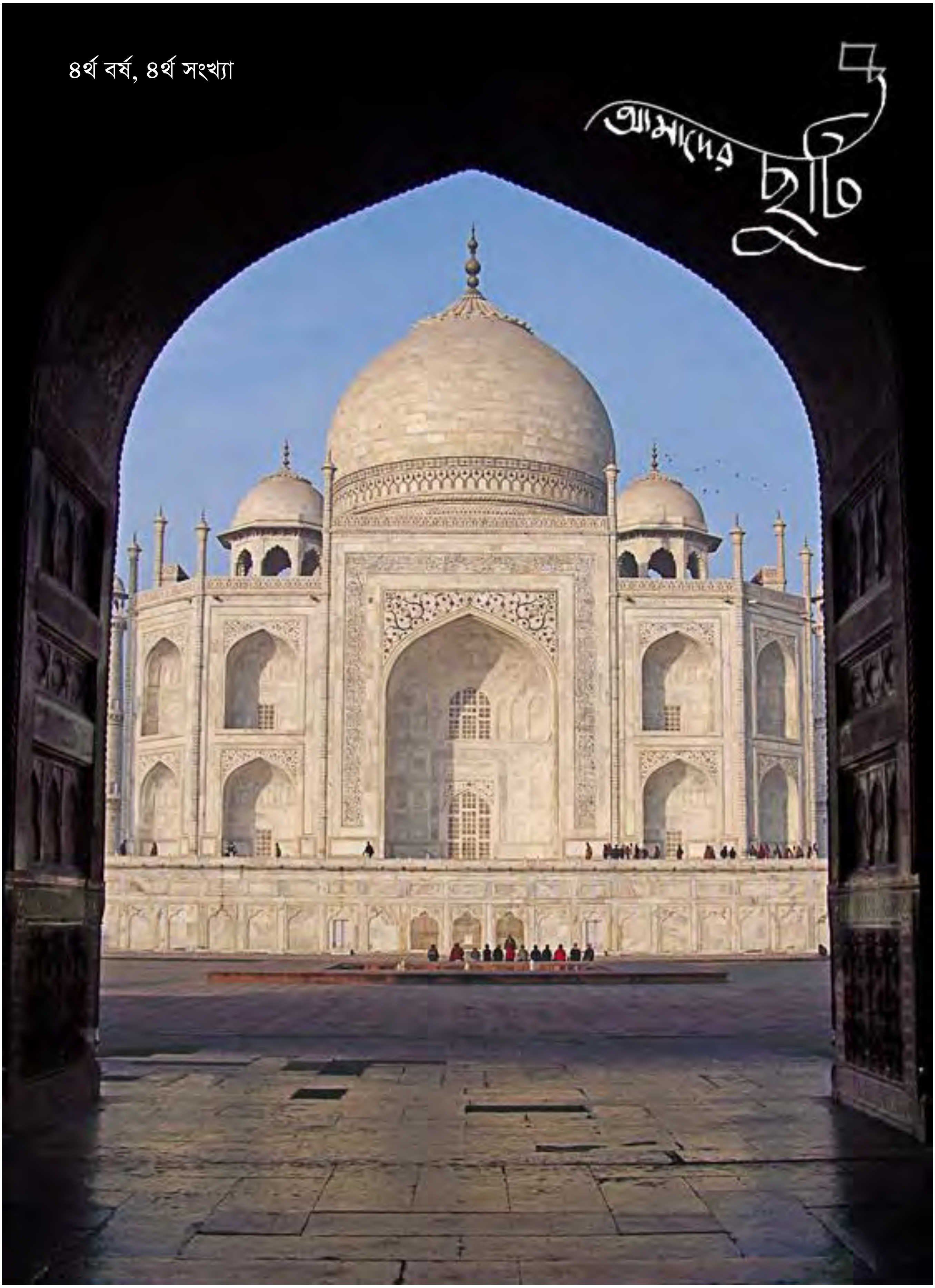

তাজমহলে সকাল
আলোকচিত্রী - সিদ্ধার্থ পাল

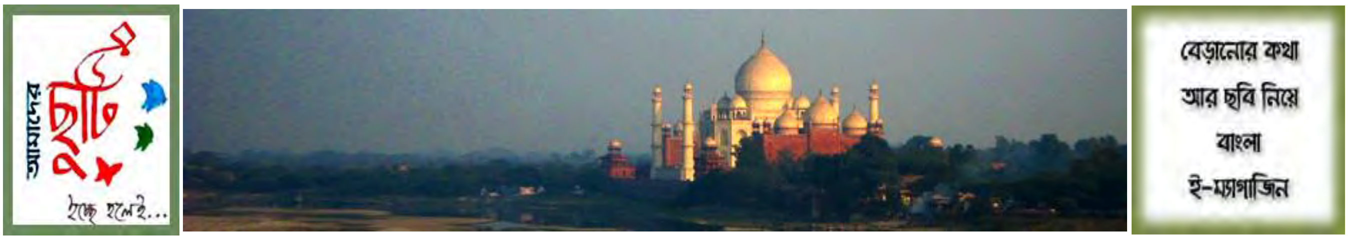

~ ৪র্থ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা - মাঘ ১৪২১ ~

বলেন কী মশায়, দুটো ছবির জন্য দুশো কিলোমিটার তাও আবার দু-দুবার! - জটায়ু থাকলে নির্ঘাৎ এই কথাই বলতেন 'শান্তিনিকেতনে সাসপেন্স'-এ।

প্রায় রহস্য সমাধানের মতই কয়েকমাস ধরে ঘুরে ঘুরে খোঁজা আর শেষ মাস দুয়েক যাবৎ প্রবল টেনশনে থাকার পর লেখা-ছবি সব উদ্ধার করে অবলা বসুর জন্মের সার্ধশতবর্ষে ক্ষুদ্র প্রয়াস 'অবলা বসুর ভ্রমণকথা' - 'পরশপাথর' প্রকাশনার সৌজন্যে।

পেছনে রয়ে গেল অনেকটা অকথিত ভ্রমণ কাহিনি অথবা না-ভ্রমণ কথা। জাতীয় গ্রন্থাগার, সাহিত্য পরিষৎ লাইব্রেরি, চৈতন্য লাইব্রেরি, সেন্টার ফর স্টাডিজ, গোলপার্কে রামকৃষ্ণ মিশন লাইব্রেরি, কলকাতা-যাদবপুর- রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরি, বালি লাইব্রেরি, বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরি, ব্রাহ্ম সমাজ লাইব্রেরি, এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগার, বসু বিজ্ঞান মন্দির, ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়, নারী শিক্ষা নিকেতন, জগদীশচন্দ্র-অবলার নিজেদের বাড়িতে - অবলার লেখা খোঁজার জন্য অধিকাংশ জায়গায় হানা দিয়েছি সশরীরে কোথাওবা পরিচিত কাউকে খোঁজ নিতে বলেছি যদি কোনও 'ক্লু' পাওয়া যায়। কখনও অযাচিত ভালো ব্যবহার পেয়েছি, কখনওবা নিবিড় উদাসীনতা। কোথাওবা নিতান্ত বেঁচে গেছি গলা ধাক্কা খাওয়ার থেকে। অকপটে সাহায্য চেয়েছি, অকপটে সাহায্য পেয়েছি-ও পরিচিত-অপরিচিতের কাছে, আবার কখনওবা আতঙ্কিত হয়েছি 'কেস'টা বোধহয় অন্য কারোর হাতেই চলে গেল এই ভেবে, আহত হয়েছি মানুষের ব্যবহারে, ভুল বোঝায়। ব্যাগ কাঁধে কলকাতার রাস্তায় একা একা হাঁটতে হাঁটতে মনে হয়েছে সত্যি বাঙালি বড় আত্মবিস্মৃত জাতি। মনে হয়েছে, আজ আমি লেখাপড়া শিখে যে স্বাধীন জীবন যাপন করছি তার পিছনে শুধু রামমোহন-বিদ্যাসাগর নন, তার থেকে অনেক বেশি ভূমিকা আছে সেইসব মেয়েদের যারা প্রথম স্বাধীনতার আকাঙ্খায় সমাজের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ঘরের বাইরে পা রেখেছিল, কলম তুলে নিয়েছিল সেই সাহসিকতার কথা অন্য মেয়েদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। তাঁদের কাছে প্রতিটি শিক্ষিত বাঙালি মেয়েরই কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। চৈতন্য লাইব্রেরির সুদীপবাবু আমি কাজটা ভালোলাগা থেকে করছি জেনে প্রশ্ন করেছিলেন, 'সখ?' হাঁটতে হাঁটতে মনে হল - দায়বদ্ধতা বোধহয় আরও বেশি।

নারী শিক্ষা এবং নারী স্বাধীনতা নিয়ে শুধু কথা নয়, হাতে কলমে কাজ করেছিলেন অবলা। তাঁরই অর্থে এবং সাধনায় গড়া ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে শুনি, আমাদের কাছে অবলা বসুর কিছু নেই-টেই...। বসু পরিবারের বাড়িটি যে ট্রাস্টির হাতে রয়েছে, তাঁদের আমন্ত্রণে অবলা বসুর জন্মের সার্ধ শতবর্ষের অনুষ্ঠানে গিয়ে কোথাও প্রায় অবলার অস্তিত্বই খুঁজে পাইনা। খুব বিনীতভাবে বইটির কথা প্রচারের জন্য জানালে শুনতে হয় - ওইতো একজন অবলা বসুর ভ্রমণের কথা বললেন, আবার কী? আয়োজক সংস্থাগুলির কার্যের বিজ্ঞাপনী প্রচার চলে একের পর এক। লাঞ্চে ফ্রায়েড রাইস, চিকেন চাঁপ ইত্যাদির প্যাকেট নিয়ে বাড়ি ফিরতে ফিরতে ভাবি যাক অবলা বসুর কল্যাণে এবেলা বিনি পয়সার ভোজ তো হল। এমন রোমাঞ্চকর সব ভ্রমণ আমার হতেই থাকে।

আবার নারী শিক্ষা সমিতির কাছ থেকে আন্তরিক সহায়তা পেয়ে আর অবলা বসুর স্মরণে আয়োজিত ছোট্ট ঘরোয়া অনুষ্ঠানটিতে উপস্থিত হয়ে আশ্বস্ত হই এই ভেবে যে এখনও কেউ কেউ সেই মহীয়সীকে মনে রেখেছেন।

শেষপর্যন্ত তাই শান্তিনিকেতনে বারবার। একা নয়, সপরিবারেই। সেও আরেক কাহিনি..। এই দুবারে একবারও ভালো করে ঘুরে দেখিনি রবীন্দ্রনাথের বাড়ি-ঘর-পাঠশালা। কে যেন আমায় বলেছে বিশু পাগল আজকাল আর ওখানে থাকেনা।

নতুন বছরে অবলা বসুকে নতুন করে খুঁজে পাঠকের কাছে পৌঁছে দিতে পেরে আমার মন ভালো হয়ে গেছে। আপনারাও ভালো থাকুন সকলে, 'আমাদের ছুটি'-র সঙ্গে নতুন আর পুরোনো ভ্রমণে, ভ্রমণ কাহিনিতে।

- দময়ন্তী দাশগুপ্ত

এই সংখ্যায় -

"কতক পথ যাইতে না যাইতে অর্দ্ধ-প্রকাশিত, অর্দ্ধ-লুক্কায়িত ভাবে নীলাকাশ স্পর্শ করিতে করিতে তাজমহলের ধবল প্রস্তর নির্ম্মিত অপূর্ব দীপ্তিময় শিল্প-প্রভার উজ্জ্বল গৌরব আমাদিগের দৃষ্টিপথে সহসা প্রতিভাত হইল, এবং সেই স্বপ্নময় স্মৃতিমাখা তাজের গগণস্পর্শী শ্বেত চূড়া কতক দেখিয়াই কেমন যেন এক মোহ স্বপ্নে ডুবিয়া গেলাম।"

- 'আর্য্যাবর্ত্তে বঙ্গমহিলা' (আগ্রাপর্ব) প্রসন্নময়ী দেবীর কলমে

~ চরৈবতি ~

জীবনে প্রথমবার ট্রেকিং করতে গিয়ে ঘুরেছিলেন হেমকুণ্ড, ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স, বদ্রীনারায়ণ, মানা, বসুধারা, ত্রিযুগী নারায়ণ, কেদারনাথ, গঙ্গোত্রী-গোমুখ ও যমুণোত্রী। ফিরে এসে ডায়েরির পাতায় লিখে রেখেছিলেন ভ্রমণের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার কথা।

- সুবীর কুমার রায়ের ভ্রমণ ধারাবাহিক 'হিমালয়ের ডায়েরি'-র এবারে তৃতীয় পর্ব - "বদ্রীনারায়ণ থেকে মানা ও বসুধারা"

~ আরশিনগর ~

ভালকি মাচানের ডাকে - তপন পাল

পাহাড় পানির দেশে - মহম্মদ মহিউদ্দিন

~ সব পেয়েছির দেশ ~

[*তাজমহল - প্রেমে অপ্রেমে - দময়ন্তী দাশগুপ্ত*]

[*দেবতাদের রাজ্যে দুর্যোগে - দেবাশিস বসু*]

[*কাজিরাঙ্গা জঙ্গল ক্যাম্পে তিনদিন - শ্রাবণী দাশগুপ্ত*]

~ ভুবনডাঙা ~

[*ভিন্ন স্বাদের ইতালি - শ্রাবণী ব্যানার্জি*]

[*অন্নপূর্ণা বেস ক্যাম্প ট্রেকিং - স্নেহাদ্রি মেউর*]

~ শেষ পাতা ~

ভার্সের চিঠি - বর্ণালী রায়

সুন্দরবনের অন্দরে - মনিরুল ইসলাম মল্লিক

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com

© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu

Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

বেড়ানোর মতই বইপড়ার আদতও বাঙালির চেনা সখ - তা ছাপা হোক বা ই-বুক। পুরোনো এই ভ্রমণ কাহিনিগুলির নস্টালজিয়া তাতে এনে দেয় একটা অন্যরকম আমেজ। আজকের ভ্রমণপ্রিয় বাঙালি লেখক-পাঠকেরা অনেকেই শতাব্দী প্রাচীন সেইসব লেখাগুলি পড়ার সুযোগ পাননি। 'আমাদের ছুটি'-র পাঠকদের জন্য এবার পুরোনো পত্রিকার পাতা থেকে অথবা পুরোনো বইয়ের কিছু কিছু নির্বাচিত অংশ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে পত্রিকার পাতায়।

[আনুমানিক ১৮৫৭ সালে অধুনা বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার হরিপুরে প্রসন্নময়ী দেবীর জন্ম হয় - দুর্গাদাস চৌধুরী ও মগ্নময়ী দেবীর প্রথম সন্তান। শৈশবে পিতার কাছেই লেখাপড়ার প্রাথমিক পাঠ। দশ বছর বয়সে পাবনা গুণাইগাছার কৃষ্ণকুমার বাগচীর সঙ্গে বিবাহ। বিয়ের মাত্র বছর দুয়েকের মধ্যে স্বামী উন্মাদরোগগ্রস্ত হওয়ায় প্রসন্নময়ী বাবা-মায়ের কাছে ফিরে আসেন। তাঁকে ইংরেজি ও গীতবাদ্য শেখানোর জন্য মেম-শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করা হয়। অসুস্থ শরীর সারাতে দুই ভাইয়ের সঙ্গে উত্তর ভারত ভ্রমণ করেন প্রসন্নময়ী। ঊনবিংশ শতকে 'আলোচনা' ও 'নব্যভারত' পত্রিকায় তাঁর এই ভ্রমণ কাহিনি 'আর্য্যাবর্ত্তে বঙ্গমহিলা' নামে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হত। এইসময়ে তিনি 'নীহারিকা' ছদ্মনামে লিখতেন। এরই প্রথম অংশ পুস্তকাকারেও সেইসময় প্রকাশিত হয়েছিল। 'আর্য্যাবর্ত্ত - জনৈক বঙ্গমহিলার ভ্রমণকাহিনী' - ১৮৮৮ সালে প্রকাশিত এই বইটিই বাঙালি মহিলার লেখা প্রথম ভারত ভ্রমণ পুস্তক। আগের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই অনেক পরে তিনি আরও দুটি ভ্রমণ কাহিনি লিখেছিলেন 'সুপ্রভাত' এবং 'নবশক্তি' পত্রিকায়। সেই সময়কার নানা সাময়িকপত্রে তাঁর কবিতা ও নানাবিধ গদ্যরচনা প্রকাশিত হত। তাঁর প্রথম কবিতার পুস্তক 'আধ-আধ-ভাষিণী' ১৮৭০ সালে (১২৭৬ বঙ্গাব্দে) প্রকাশিত হয়। তাঁর রচিত আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই - 'বনলতা' ও 'নীহারিকা' (কাব্যগ্রন্থ), 'অশোকা' (উপন্যাস), 'আর্য্যাবর্ত্ত' (ভ্রমণ-বৃত্তান্ত), 'পূর্ব্বকথা' (আত্মজীবনীমূলক প্রবন্ধ)। একমাত্র সন্তান প্রিয়ম্বদা দেবীও লেখিকা হিসেবে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। বেশ কয়েকটি ভ্রমণ কাহিনিও লিখেছিলেন প্রিয়ম্বদা। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে প্রসন্নময়ীর মৃত্যু হয়।
'নব্যভারত'-এ প্রকাশিত মূল ধারাবাহিক লেখাটির কিছু নির্বাচিত অংশ এখানে প্রকাশিত হল।]

আর্য্যাবর্ত্তে বঙ্গমহিলা

প্রসন্নময়ী দেবী

এটোয়া পরিত্যাগ।

২৪ ফেব্রুয়ারি, প্রত্যুষের ট্রেণে আমরা এটোয়া ত্যাগ করিয়া আগ্রাভিমুখে যাত্রা করি। প্রভাতে গাড়ী "তুণ্ডুলা" পৌঁছিলে সে গাড়ী ছাড়িয়া আগ্রার গাড়ীতে উঠিলাম এবং ৮৷৷০ ঘটিকার সময় আগ্রা গিয়া উত্তীর্ণ হইলাম। কতক পথ যাইতে না যাইতে অর্দ্ধ-প্রকাশিত, অর্দ্ধ-লুক্কায়িত ভাবে নীলাকাশ স্পর্শ করিতে করিতে তাজমহলের ধবল প্রস্তর নির্ম্মিত অপূর্ব দীপ্তিময় শিল্প-প্রভার উজ্জ্বল গৌরব আমাদিগের দৃষ্টিপথে সহসা প্রতিভাত হইল, এবং সেই স্বপ্নময় স্মৃতিমাখা তাজের গগণস্পর্শী শ্বেত চূড়া কতক দেখিয়াই কেমন যেন এক মোহ স্বপ্নে ডুবিয়া গেলাম। আমি সে অবস্থা বর্ণনার চেষ্টা করিব না। চক্ষের সম্মুখে সকলি জীবন্ত চিত্র, অথচ যেন তাহা বহু দিন দৃষ্ট অতীত স্বপ্নবৎ ভাবপূর্ণ, স্মৃতিতে জাগিবে জাগিবে করিয়া জাগিতেছে না, দেখিতে পাওয়া যাইতেছে সব, কিন্তু ছুঁইতে কি ধরিতে ক্ষমতা নাই। দূর হইতে সেই মানসমোহন তাজমহলের শিখরমালা নিরীক্ষণ করিয়া কত আশার কথা, কত নিরাশার অশ্রু হৃদয়কে সুখে দুঃখে হাসি কান্নাময় করিয়া ফেলিল, - আমি আমাকে তখন ভুলিবার জন্য অন্যমনা হইবার প্রয়াস পাইলাম, এমন সময় উদার সৌন্দর্য্য-পূর্ণ সুবিস্তৃত যমুনা সেতু দেখিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে তাজমহল ভুলিয়া গেলাম এবং "যমুনা লহরী" সঙ্গীতের "নির্ম্মল সলিলে বহিছ সদা, তটশালিনী সুন্দর যমুনে ও" ভাবিতে ভাবিতে সেতু পার হইলাম।

আমরা গাড়ী হইতে নামিয়া পথভ্রান্ত পথিকপ্রায়, ক্লান্তভাবে, কোথায় যাইব, কি করিব ভাবিয়া (Overland) সেতুর উপর কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। তখন একজন হিন্দুস্থানী, বর্ণে কাফ্রী বিনিন্দিত, নাসিকায় চীনবাসী লজ্জা পায়, স্বশরীরে আসিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া একখান খাতা দেখাইল। তাহাতে অনেক বাঙ্গালী যাত্রীর পরিচিত নাম দেখিয়া আমরাও তাহার গৃহে বাসা লইতে স্বীকৃত হইলাম। তার গৃহে যাইবার সময় পথি-মধ্যে কয়েকটী স্ত্রীলোক সহসা আমাদিগকে যেন ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা করিল। তাহারা ইতর স্ত্রীলোক, বিদেশী পথিকদিগকে প্রলোভন দেখাইয়া আগে নিজ গৃহে লইয়া যায় ও পরে যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করে। আমরা বহু কষ্টে সেই মায়ারূপিনী রাক্ষসীগণের হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়া পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির গৃহে বাসা লইলাম।

আমরা যে গৃহে বাসা লইয়াছিলাম, তাহা দ্বিতল ও যমুনা নিকটস্থ রাজ পথবর্ত্তী। পথশ্রান্তির পর তাহা পরিপাটী এবং নয়ন-তৃপ্তিকর বোধ হইল।

আমরা আসিবা মাত্র কিরূপে যে সেই সংবাদ আগ্রাবাসী ফেরিওয়ালাদিগের মধ্যে টেলিগ্রাফ হইল, সে রহস্যভেদ করিতে এখনও পারি না। অল্প কালের মধ্যেই তাহারা ঝাকে২ আসিতে লাগিল ও নানা প্রকার কারুকার্য্য বিশিষ্ট বিবিধ প্রস্তর সামগ্রী বিক্রয়ার্থে আনিয়া মন ভুলাইতে লাগিল। সেই সকল সুন্দরতর শিল্পকার্য্য দেখিয়া মন আনন্দে পরিপ্লুত হইয়া যায়। তবে তাহার অসম্ভব মূল্য শুনিয়া দীনহীনের হর্ষ বিষাদে পরিণত হইয়া থাকে। ধর্ম্মভয়-বিরহিত বিক্রেতাগণ সর্ব্বত্রই সমান। সেই বিক্রেতাদিগের মধ্যে কেহ কেহ আবার অপেক্ষাকৃত কিছু বেশি বুদ্ধিমান্। তাহারা বিক্রীত দ্রব্যের সহিত অনেক বড় লোকের নামও মস্তকে বহন করে এবং বাঙ্গালী দেখিলে তাহা বিজয় নিশান স্বরূপ দর্শন করাইয়া থাকে। তাহাদিগের সেই পণ্য দ্রব্যের অংশ রূপ নামাবলীর মধ্যে প্রত্নতত্ত্ববিৎ শ্রীযুত রাজেন্দ্র লাল মিত্র মহাশয়ের নাম দেখিলাম। কিন্তু তাহাতে দাম করিয়া দ্রব্যক্রয়ের কোনই সুবিধা হইল না। তখন ভাবিলাম, "স্বদেশীয় (এন্টিকোয়েরিয়ান) পণ্ডিত ব্যক্তির নামে বিদেশে সুলভ মূল্যে কিছু পাওয়া যায় না, বরং বড় লোকের রেটে গরিবরা অনেক সময় মারা যায়।" দূর প্রবাসে স্বজাতির পণ্ডিত ব্যক্তির অপরিচিত নিদর্শন হস্তাক্ষর দেখিয়া, সত্যই বড় আনন্দিত হইয়াছিলাম। তাহা দেখাইয়া যে বিক্রেতাগণ আমাদিগকে ঠকাইতে পারে নাই, সে জন্য এখনও সন্তুষ্ট আছি। আমরা আহারান্তে সেই দিনই আগ্রানগরী, তাজ এবং যমুনার শোভা দেখিবার জন্য বাহির হইলাম।

অগ্রবন
(আগ্রা)

অগ্রবন মোগল বাদসাহদিগের সময়ের মহা সমৃদ্ধিশালী রাজধানী ও হিন্দুদিগের একটী তীর্থ, মথুরা বৃন্দাবনের চৌষট্টি ক্রোশের মধ্যে যে সকল স্থান আছে, সে সমুদায় তীর্থ মধ্যে পরিগণিত এবং তাহাদের অগ্রবর্ত্তী বলিয়াই আগ্রার প্রাচীন নাম অগ্রবন। ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ এখানেও বিহার করেন, তাহাতেই তীর্থযাত্রী বৈষ্ণবগণ রীতিমত পূর্ব্বে অগ্রবন পরিদর্শন ও যমুনায় স্নানাদি করিয়া শেষে মথুরা বৃন্দাবন যায়। আমরা তীর্থ-যাত্রী না হইলেও, আগে অগ্রবন দর্শন করি, তবে যমুনায় স্নান করিবার সৌভাগ্য আমার ভাগ্যে ঘটে নাই।

যমুনার তীরপরি সৌষ্টবময়ী শ্রী-সম্পন্না "সুন্দরীতরা" প্রস্ফুটিতা নগরী আগ্রা আলেখ্যবৎ বিরাজিতা। তাহার অতুলনীয় "ধবল সৌধছবি" নীল সলিলে আপনার মুখ আপনি দেখিয়া দেখিয়া যেন প্রতিবার মুগ্ধ হইয়া যাইতেছে। সেই প্রতিবিম্বিত রূপরাশি "মরি মরি কোন বিধাতা গড়িয়া ছিলরে।" দর্শকের চিত্তমুগ্ধকর সে শোভার কথা কিরূপে ভাষায় প্রকাশ করিব?

অসংখ্য জনস্রোত আগ্রার বৃহৎ প্রস্তরময় রাজপথে অবিরাম প্রবাহিত হইতেছে, তাহার বিরাম নাই, কেবলি কলরব ও মনুষ্যমস্তক শুনিবে এবং দেখিবে মাত্র। সেই কঠিন শিলাময় ধূলিরঞ্জিত রাজবর্ত্মে পদব্রজে বাহির হওয়া সুখকর ব্যাপার বোধ হয় না।

আগ্রার বিপণীগুলি পরিপাটী রূপে সুসজ্জিত এবং প্রস্তরের কারুকার্য্যের দোকান সকল নয়ন-প্রীতিকর। পথিকগণ রাজ পথে চলিতে চলিতে অনেক সময় অনন্যমনে সেই স্থানে দাঁড়াইয়া যায় ও তাহা দেখিয়া যেন পথক্লান্তি দূর করিয়া থাকে।

তাজ।

যখন অস্তগামী অংশুমালীর কনক-কিরণে পশ্চিমাকাশ অনুরঞ্জিত, সেই হৈম রশ্মিকণা যমুনার নীলবক্ষে মৃদুল তরঙ্গে কখন ভাসিয়া, কখন ডুবিয়া জলক্রীড়া করিতেছিল, যমুনা-হৃদয়ে সেই কিরণমালার লুকোচুরী খেলা - শোভার মাধুরী নয়ন ভরিয়া দেখিতে দেখিতে দিবাবসানে আমরাও তাজমহলের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলাম।

ইতিহাসে ও বন্ধুপ্রমুখাৎ আশৈশব শ্রবণ করিয়া এবং কল্পনা নেত্রে নির্জ্জনে কখন কখন দেখিয়া তাজমহল যেন আমার চিরপরিচিত হইয়া গিয়াছিল। সে কল্পনা-জাত মানসচিত্র তাজমহল, এখন আবার তাহার অপূর্ব্বশরীরী মাধুরীময় ছবি, সেই সর্ব্বজন-মনোমোহনমূর্ত্তি চক্ষুর সম্মুখে জীবন্ত হেরিয়া হৃদয় কেমন যে হইয়া গেল, সৌন্দর্য্য-মুগ্ধ আমি স্তম্ভিত ও অবাক হইয়া গেলাম এবং মুহূর্ত্ত মাত্র শূন্য দৃষ্টিতে সেই অনন্ত শোভাপূর্ণ অমরাবতীসম প্রণয়-সমাধি-সৌধের কারুকার্য্য নিরীক্ষণ করিয়া আত্মহারা হইয়া কি যেন ভাবিতে লাগিলাম। সে স্মৃতিময় চিন্তা শৈশবের সুখস্বপ্নের মত অস্ফুট নহে। প্রকৃত প্রণয়ের প্রথম দৃষ্টির ন্যায় তাহা মধুময়, প্রিয়তমের প্রেম-সম্ভাষণের ন্যায় তাহা প্রাণস্পর্শকর, ললিত সঙ্গীত অনুভবে আজিও তাহা হৃদয়ে সজীবতা আনিয়া দেয়। সে স্মৃতি ভুলিবার নহে। পৃথিবীতে "সাতটী আশ্চর্য্য দ্রব্য" আছে, আমার ভাগ্যে অন্যগুলির দর্শন না ঘটিলেও, তাজমহলকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিতে যেন ইচ্ছা করে। কঠিন প্রস্তরে ললিত সঙ্গীত, ভাবুক জনহৃদয়ে আশার হাস্য, প্রণয়ের স্বপ্নময় সুখদ সম্মিলন এবং শিল্পের চরোমোৎকর্ষ অপূর্ব্ব শিলায় একত্র সন্নিবেশিত দেখিয়া, কে না ক্ষণকালের নিমিত্ত, এই রোগ শোক দুঃখ বিজড়িত পার্থিব জগৎ এবং মনুষ্যজীবনের গত নৈরাশ্যের যন্ত্রণা ভুলিয়া যাইবে?

মৃতপত্নীর প্রণয়-স্মৃতি ইহ জগতে চিরস্থায়ী করিবার জন্য এই অমূল্য, অতুলনীয় তাজ (সমাধি) নির্ম্মিত হইয়াছে। অপরিমিত অর্থ, অক্লান্ত পরিশ্রম এবং শিল্পের চরমোৎকর্ষ ইহাতে পর্য্যবসিত হইয়া গিয়াছে। তীর্থস্থানে কোন মহাপুরুষ কিম্বা কোন দেবমূর্ত্তি দর্শন করিবার নিমিত্ত পর্ব্বদিনে যেমন জনসমাগম হইয়া থাকে, তেমনি প্রতিদিন প্রদোষে এই অমর সমাধি দর্শনার্থে অগণ্য লোক একত্র দেখিতে পাওয়া যায় ও বারেক মাত্র সকলে যেন ইহার শোভা দেখিয়া নয়ন সার্থক জ্ঞান করে। প্রদীপ্ত চন্দ্রালোকে তাজ দেখিতে আরো মনোহর।

তাজমহলের অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া জনৈক ইংরাজ মহিলা একটী কবিতায় লিখিয়াছিলেন যে, "তুমি নারী কুলে ভাগ্যবতী, তাই এই স্বর্গীয় রশ্মিমালাবিনির্ম্মিত তাজ তোমার সমাধিমন্দির, তুমিই পতি-সোহাগিনী, তোমার ন্যায় ভাগ্য এজগতে কাহার আর?" কিন্তু আমি তাজ দেখিয়া এত যে মোহিত হইয়াছিলাম, স্বর্গের স্বাপ্নিক মাধুরী যেন প্রস্তরে বিকশিত দেখিলাম বোধ হইল, - তথাচ আমি মনে করি, প্রকৃত অকৃত্রিম অপার্থিব পবিত্র প্রণয় এই সুন্দর মহান সমাধি-সৌধ তাজ অপেক্ষা সুন্দরতর, মহত্তর ও অনন্ত সজীব। প্রকৃত এবং অমর প্রণয়ের গৌরবে অযুত অযুত তাজ নিমগ্ন ও বিলীন হইয়া যায়। যে প্রণয়ে নাস্তিক হৃদয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও পরলোকে বিশ্বাস, ব্রাহ্মে পৌত্তলিকতা এবং ইহজীবনেই অনন্ত অক্ষয় জীবন্ত স্বর্গ আনয়ন করে ও যে প্রেমে দুই পৃথক আত্মা একত্রীভূত হইয়া পরমাত্মাতে শেষে সম্মিলিত হয়, ও একের অস্তিত্বে অন্য জীবন ধারণ করে, সে প্রণয়ের স্মৃতি চিরস্থায়ী করিবার জন্য কোন পার্থিব সমাধির যে প্রয়োজন আছে, আমি ত তাহা বুঝিতে পারি না। একজনের মৃত্যুতে অন্য একজন জীবিত, ইহলোকেই যাহার জীবন্ত সমাধি হইয়া থাকে, সেই অপার্থিব প্রেমের অবিনশ্বর সমাধির স্থান এ অনন্ত বিভব নহে। তাজমহল স্বরূপ অলৌকিক সমাধিমন্দির দেখিয়াও তাহার অভ্যন্তরে চিরনিদ্রিতা সাজাহান প্রেয়সী মহিষীকে "নারীকুলে ভাগ্যবতী" কিম্বা "পতি-সোহাগিনী" বলিয়া আমি মনে করি না।

তাজ দেখিয়া অনেক ইংরাজ ভ্রমণকারী নানা প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন, সে সকল এস্থলে উল্লেখ করিবার কোন প্রয়োজন নাই - কিন্তু কিছুদিন হইল একজন ইংরাজ, Statesman পত্রিকায় ঐ বিষয় সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে বেশ একটু নূতনত্ব ও সার আছে এবং আমি তাঁহার মত সম্পূর্ণ সহানুভূতির সহিত গ্রহণ করিয়াছি।

সাজাহান আপন সুন্দরী প্রিয়তমা রমণীর সমাধিহর্ম্ম্যে অগণ্য অর্থ ঐ প্রকারে ব্যয় না করিয়া, যদি তাঁহার স্মরণার্থে কোন পতিতাশ্রম, পান্থশালা কিম্বা কোন শিক্ষালয় স্থাপন করিয়া যাইতেন, তাহাতে তাঁহার কীর্ত্তিময় উপকার জগতে যেমন চিরস্থায়ী ও স্মরণীয় হইত, ইহাতে সে প্রকার কিছু হয় নাই। কখন কোন পথিক দর্শক, অথবা কোন ভ্রমণকারী একদিন মাত্র তাজ দেখিয়া যে সুখ পায়, তাহা অকিঞ্চিৎকর! তাজমহলের দ্বারা সংসারের অন্য কোনই উপকার দেখি না। ইহাকে হৃদয়বিহীন পাষাণময়ী দেব প্রতিমার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে, কারণ, বাহিরে তাহার অতুলনীয় শোভাময় হেম কিরণবৎ মাধুরী ঝরিয়া পড়িতেছে যেন দেখিয়া মনে হয়, অঙ্গুলী দ্বারা স্পর্শ করিতে সাহস হয় না, বোধ হয় যেন মনুষ্যের কর স্পর্শে তাহার দেবত্ব, কমনীয় কান্তি মলিন হইয়া যাইবে, "ছুঁইলে নখের কোণে বিষম বাজিবে প্রাণে" ভাবিয়া কোমন স্নেহের করেও স্পর্শ করিতে প্রাণে কেমন ব্যথা লাগে, কিন্তু তাহার হৃদয় মাঝারে মৃত শরীর সমাধি শয্যায় প্রোথিত রহিয়াছে, ভাবিলে, কল্পনায়ও মন বিষণ্ণ হইয়া যায়। বাহিরের চাকচিক্যে ভিতরের মলিনতা দূর হয় না। অমিশ্রিত পবিত্রতা অতীব উপাদেয় এবং অপার্থিব।

তাজমহলের ভিতর প্রবেশ করিবার সময় মুসলমানগণ জুতা পরিহার করিতে বারম্বার অনুরোধ করে এবং কখন বা দীন হীন দেখিলে কিছু কর্কশতা প্রদর্শন করিয়া থাকে। কিন্তু শ্বেতপদের সর্ব্বত্র সমান সম্মান ও অধিকার, মানবের সমাধি-মন্দির-প্রবেশে দেবজাতি পাদুকা ত্যাগ করিবে কেন? এই পাদুকা রহস্য অবলম্বন করিয়া সেই স্থানীয় মুসলমানেরা বিষণ্ণ ভাবে যাহা বলে, তাহার অর্থ, -

"বৃটিশ সিংহের বিকট বদন,
না পারি নির্ভয়ে করিতে দর্শন,
কি বাণিজ্যকারী অথবা প্রহরী -
জাহাজী গৌরাঙ্গ কিবা ভেকধারী,
সম্রাট ভাবিয়া পূজি সবারে।"

তাজমহল, তাহার সম্মুখস্থ রমণীয় পুষ্পোদ্যান এবং তাহার হৃদয়ে কৃত্রিম উৎস একে একে নয়ন ভরিয়া অবলোকন করিয়া পরিশেষে আমরা সায়াহ্ন সমীরণ সেবন করিতে করিতে মন্দির ইসলামদৌলা* (ইহার প্রকৃত উচ্চারণ আমি জানি না, সেখানে যাহা শুনিয়াছি, তাহাই লিখিলাম) গিয়া পৌঁছিলাম। এই রম্য হর্ম্ম্যের প্রস্তরময় ভিত্তি যমুনা-বক্ষে প্রোথিত। আগ্রার সৌধমালার প্রত্যেকটীর এমন এক অপরূপ সৌন্দর্য্য আছে যে, তাহার কোন্‌টী রাখিয়া কোন্‌টী দেখিব, তাহা অনুমান করা যায় না। বাদসাগণ এই ইসলামদৌলার প্রশস্ত উচ্চ প্রোথিত প্রাঙ্গণে বসিয়া প্রদোষে যমুনার জলক্রীড়া দর্শন করিতেন। সেই অনৈসর্গিক রূপরাশি যমুনা, যখনি দেখা যায় তখনি মন আহ্লাদে পরিপ্লুত হইয়া থাকে, বটে, কিন্তু সৌন্দর্য্যময়ী নীলবর্ণা যমুনা বর্ষাকালে যখন পূর্ণাঙ্গিনী হইয়া রূপভরে উছলিয়া পড়ে, তৎকালে তাহার সেই তরঙ্গায়িত পূর্ণ মাধুরী কল্পনাতীত শোভা ধারণ করে। অতীতের সাক্ষী-রূপিণী "লীলাময়ী যমুনার তরঙ্গ" নিচয় দর্শন করিয়া অনেক বিষাদময়ী চিন্তার আঘাত আমার হৃদয়ে লাগিয়াছিল।

উৎসব দিবাবসানে, প্রিয়জন প্রবাসগমনে, বিজয়াদশমীর দিনে, নির্জ্জন গৃহে একক নিশীথে হৃদয় যেমন এক প্রকার অবসাদ ও পরিত্যক্ত ভাবে নৈরাশ্যের অন্ধকারে নিমগ্ন হইয়া যায় ও সুখময় ভূত স্মৃতি কেবল মাত্র শূন্যতা আনয়ন করে, যমুনার তীর ছাড়িয়া আমার মনও সেই প্রকার কেমন এক অবসন্ন ভাবে বিষাদে ডুবিয়া গিয়াছিল। অশান্তির স্বপ্নময় ভাঙ্গাভাঙ্গা নিদ্রায় দীর্ঘ রজনী অতিবাহিত করিলাম। সুখ দুঃখ উভয়ই সমানে চলিয়া যায়, তাহার স্মৃতিমাত্র আমরা আজীবন অন্তরে বহন করি। এস্মৃতিও চিরদিন আমার হৃদয়ে জাগরূক থাকিবে।

দুর্গ।

পরদিন অরুণোদয়ে শয্যা ত্যাগ করিয়া আমরা আগ্রাদুর্গ প্রবেশার্থে "পাস" (Pass) সংগ্রহে ব্যস্ত হইলাম। বিশ্রাম বারে (রবিবার) ইংরাজের আফিস ইত্যাদি বন্ধ, সুতরাং পাস পাইতে সে দিন একটু পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিতে হইল। শুনিলাম, সেখানকার Brigade General লোক ভাল, ভদ্রলোকের সম্মান রাখিয়া থাকেন। আমরা তাঁর কর্ম্মচারীগণের নিকট পাস পাইলাম। আমরা দুর্গ ইত্যাদি দেখিবার জন্য বেলা প্রায় দ্বিতীয় প্রহরের সময় বাসা পরিত্যাগ করিলাম। প্রথমে দুর্গদ্বারে প্রবেশ করিবামাত্র জনৈক সজ্জিত শিক সৈনিক আমাদিগের পাস দেখিতে চাহিল। আমাদের গাড়ীর বাহিরে General সাহেবের চাপরাশি ছিল, সে মুখে পাস আছে কহিয়া অন্যদ্বারে গাড়ী লইয়া গেল। আমরাও সেই স্থানে গাড়ী হইতে নামিলাম। দিবা দ্বিপ্রহরে পশ্চিমের আতপ তাপে দগ্ধ হওয়া বড় সুখকর নহে। প্রস্তরময় ভূমি, - তপ্ত অগ্নিকণাবৎ পদতল তাহাতে নিষ্ঠুর ভাবে দগ্ধ করিয়া এবং প্রচণ্ড সূর্য্যকর মস্তকে ধরিয়া পুড়িতে পুড়িতে তখন দুর্গের মধ্যে যাইবার নিমিত্ত দ্বিতীয় দ্বারে গিয়া দাঁড়াইলাম। সেখানে একজন গোরা সৈনিক পাহারায় বসিয়াছিল, সে আবার পাস "তলপ" করিল। এবার ত আর মুখের কথায় চলেনা, এবার তা দেখাইতে হইল। সে তাহা সম্রাট সম প্রভুত্বের সহিত মঞ্জুর করিলে আমরা দুর্গ মধ্যে যাইতে পারিলাম।

আগ্রা-দুর্গ হৃদয়ে আর একটী চিত্রিতা সুন্দরী নারী যেন শোভা পাইতেছে। তাহার মনোমোহন সৌন্দর্য্য, তখন তৃপ্তিকর চারুতা দেখিয়া কতক্ষণ চাহিয়া থাকিতে হয়। অচেতন সৌন্দর্য্য, সচেতন

জীবের প্রাণে কত আনন্দ দেয়। ইংরাজ সৈনিক পুরুষদিগের বাসগৃহগুলি এই দুর্গের ভিতর এবং তাহা অতি পরিপাটী ও পরিষ্কার। প্রাঙ্গণে সুস্থকায় প্রফুল্ল স্বাধীন প্রকৃতি ইংরাজ বালক বালিকাগণ আনন্দে ক্রীড়া করিতেছে - যেন শকুন্তলা-সুত সিংহ-শিশুর কেশর ধরিয়া বিক্রমে খেলিতেছে - এমনি স্বাধীন ও জীবন্ত ভাব। ভারতের অতীত দিনে বীরপুত্রগণ যেরূপ করিয়া ক্রীড়া করিত, তাহা কেবল পুরাণ এবং ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু এই বালকের স্বাধীনতাময় খেলায় ও নির্ভীকতায় সেই ভূত কালের চিহ্ন কিছু রহিয়াছে মনে হয়।

পূর্ব্বে যেখানে বাদসাহদিগের বিলাসভূমি ও আরাম নিকেতন ছিল, আজি সেখানে বিদেশীয় সামান্য সৈনিকগণের বাস, - ইহা দেখিলে ভবিষ্যৎ সে চির অজ্ঞাত ও ধন, সম্পদ, মান, সম্ভ্রম যে কেবলমাত্র কথার কথা, ইহাই মনে হয়। যে জীবনের শেষ চিহ্ন শ্মশান-মৃত্তিকায় কিম্বা সমাধিতলে, তাহার জন্য এত হিংসা দ্বেষ বা পরনিন্দা কেন?

"মতি মসজিদ" ও অন্যান্য প্রাসাদগুলিও এই দুর্গের মধ্যে অবস্থিত। "মতি মসজিদ" মোগল বাদসাহগণের পারিবারিক ভজনালয়, ইহাও মর্ম্মর বিনির্ম্মিত, এবং দেখিতে যেমন মনোহর, তেমনি মূল্যবান্ প্রস্তরে পূর্ব্বে ভূষিত ছিল। এখনও তাহার সেই রাজকীয় গৌরবের কতক কতক নিদর্শন রহিয়াছে, কিন্তু সে স্বজনতা আর নাই। সমাধিমন্দির অমরাবতীসদৃশ নিরুপম শোভান্বিত হইলেও, তাহার জীবনশূন্য পরিত্যক্ত ভাবে দর্শকের চিত্তরঞ্জন করিতে পারে না। যখন বন্ধু বান্ধব পরিবেষ্টিত হইয়া উপাসনালয়ে বাদসাহগণ "নমাজ" করিতেন, সে এক দিন, আর আজ এ এক দিন। সময়ের সর্ব্বসংহারক মূর্ত্তি কি ভয়ানক! যাহা যায়, তা আর ত ফিরিয়া আইসে না। থাকে কেবল - শোকের হাহাকার দৃশ্য!

বাদসাহদিগের সায়াহ্ন সমীরণ-সেবন-স্থান কেমন পূর্ব্ব আরাম স্মরণ করাইয়া দেয়। এই খানে বসিলে যমুনার লীলাময়ী শোভা মুক্তভাবে নয়নে প্রতিভাত হইয়া থাকে। আমরা ঘুরিতে ঘুরিতে যেই এই খানে আসিয়া দাঁড়াইলাম, কে যেন "যাদুকর দণ্ডসম পরশি হৃদয়,

সৃজিয়া নূতন ভব
শত দৃশ্য অভিনব
নয়ন সমীপে আজি ধরিল আমার"
কিম্বা সবার।

প্রদোষের সূর্য্যকরে যেন জগৎ নূতন এক পরিচ্ছদে আমাদের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল। আমরা তখন কি ছাড়িয়া কি দেখিব, বুঝিতে পারিলাম না। সম্রাট আকবর সকল ধর্ম্মের প্রতি ভক্তিপরায়ণ ছিলেন। শুনিলাম, তিনি নাকি এই প্রাসাদের উপর দাঁড়াইয়া অস্তগামী রবিকরে মথুরার দেব মন্দিরের চূড়াদর্শন করিতেন। একথা কতদূর সত্য তাহা জানিনা; তবে এখান হইতে অপরাহ্নে নিমীলিত দিবাকরে মথুরার দেবালয়ের চূড়া বেশ পরিষ্কার দেখা যায়। জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে যমুনা-হৃদয়-স্পর্শকারী শীতলবায়ু সেবন করিতে করিতে সম্রাটগণ এইখানে বসিয়া নর্ত্তকীকণ্ঠ বিনিঃসৃত মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিতেন।

এখানে দুইখানি "তক্ত" প্রস্তরাসন আছে। কৃষ্ণবর্ণ শিলাসনে স্বয়ং বাদসাহ ও শ্বেতাসনে বীরবল (মন্ত্রী) বসিয়া কখন কখন নিশীথে গুপ্ত দরবার করিতেন। সেই দুইখানি আসন বহুদিন রৌদ্রতাপে দগ্ধ হওয়াতে, কিম্বা যে কারণে হউক, বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে; এবং সম্রাটের কৃষ্ণাসনের মধ্যে একটা দাগ পড়িয়াছে; কিন্তু সম্পূর্ণ ভাঙ্গে নাই। তবে প্রবাদ এই যে, ইংরাজ কোম্পানী পলাসির যুদ্ধে বিজয়ী হইয়া যখন আগ্রায় আসিয়াছিলেন, তখন নাকি দুর্গের মধ্যে এদিক সেদিক বেড়াইয়া শেষ এই আসন দেখিতে আসিয়া, সম্রাটের প্রভুত্বের পরিচয় স্বরূপ এই তক্তে একলম্ফে আরোহণ করেন। তাই ইংরাজের (লম্ফ লাগিয়া) পদস্পর্শে অভিমানে কৃষ্ণাসন ফাটিয়া যায়। তাহার মধ্যে যে রক্ত বর্ণ দাগ পড়িয়াছে, তাহা অভিমানীদিগের বিদীর্ণ হৃদয়ের শোণিত চিহ্ন; প্রস্তরের লাল বর্ণ নহে।

"শীশমহল" (আয়নার প্রাসাদ) বেগমদিগের চারু নিকেতন। ইহার বাহিরের ভিত্তি চুণী "পান্না" দ্বারা বিভূষিত এবং ভিতরের সমুদায় প্রাচীর খণ্ড খণ্ড আয়নাতে বিমণ্ডিত। প্রতি প্রকোষ্ঠ এমন মনোহর, দেখিলে যেন কল্পনায় ইন্দ্রালয়ের চিত্র মানসে সমুদিত হয়। এই গৃহে একজনের প্রণয়াভিলাষিণী শত মহিলা পৃথক পৃথক ভাবে বসবাস করিতেন। এমন উপাদেয় রম্য প্রাসাদে, শত সহস্র পরিচারিকা সেবিতা ও পরিবেষ্টিতা মহিষীগণ যে নিরুপম সুখে কালাতিপাত করিতেন, ইহা আমার বিশ্বাস হয় না।

বেগমগণ প্রাসাদের নিম্নতলে তাঁহাদিগের "বাঁদী"রা থাকিত। সে স্থান অতি শোচনীয়। সূর্য্যকর দিবা দ্বিপ্রহরেও ভুলিয়াও সেখানে যাইত কি না, সে বিষয়ে সমূহ সন্দেহ আছে। রৌদ্র বায়ু পরিবর্জ্জিত সেই গৃহে বাস এবং কখন কখন বেগমসাহেবদিগের সেবার অনুমাত্র ত্রুটি হইলে আবার তাহার পার্শ্বস্থ অন্ধকূপে দণ্ডস্বরূপ কয়েদ থাকিয়া তাহারা যে মনুষ্য জীবনের প্রতি অনুরাগিনী ছিল, তাহা ত সহজে অনুভব করা যায় না।

পূর্ব্বে এই দুর্গের প্রাঙ্গণে অতি রমণীয় পুষ্পোদ্যান ছিল। কাশ্মীর, ইস্পাহান, পারস্য প্রভৃতি দেশজাত ও বহু ব্যয়ে আনীত বিবিধ উপাদেয় স্বর্গীয় গোলাপ ও নানাবিধ মনোহর কুসুমে তাহা নন্দনকানন শোভায় বিরাজিত ছিল। যেমন অন্তঃপুরে অলৌকিক লাবণ্যময়ী মহিষীগণ, তেমনি এ উদ্যানে দুর্লভ ফুল্ল কুসুমরাজি। যমুনা শীকরবাহী সমীরণ, তাহার প্রাণভরা মুক্ত সৌরভ অনিবার বহন করিয়া আগ্রার দ্বারে দ্বারে বিতরণ করিত। আজি সেই নন্দনকানন অন্ধকার, গুটিকত বিলাতী ফুলে - "ফিঁকে ভায়লেট গন্ধ নাহি তাহাতে" - তাহাকে পুষ্পোদ্যানে অবিহিত করিতেছে। শত শত কৃত্রিম উৎস, সুবাসিত বারিপূর্ণ প্রাণে, উথলিত হৃদয়ে, যেখানে ক্রীড়া করিত, এখন সেখানে জলকণার চিহ্নমাত্র নাই। বিশুষ্কভাবে সকলি পূর্ব্ব সৌভাগ্যের সহিত বিলীন হইয়া গিয়াছে।

বেগমদিগের স্নান-হর্ম্ম্য অতীব রমণীয়। তাহার প্রাচীর রজতনিভ দর্পনখণ্ডে পরিশোভিত। স্নানের নিমিত্ত ইহার ভিতর একটী বৃহৎ কৃত্রিম সরিৎ এমন কৌশলের সহিত প্রস্তুত করা হইয়াছে যে, আপনা হইতে যমুনার সুশীতল পূত বারি তাহাতে অনায়াসে আইসে এবং একজন ব্যক্তি সুখে ভাসমান হইয়া সেই তরঙ্গবিহীন সরিৎসাগরে অবগাহন করিতে পারে।

"দেওয়ানী আম" (অর্থাৎ সাধারণের সহ দরবার স্থান) এবং "দেওয়ানী খাস" (কেবল আত্মীয়ের সহিত দরবার করিবার স্থান) ক্রমে দেখিয়া যখন আমরা অন্যদিকের প্রাঙ্গণে আসিলাম, তখন উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টেনান্ট গভর্ণর "কলভিন" সাহেবের যত্ন-প্রোথিত সমাধি আমাদিগের নয়ন-পথে পতিত হইল। সিপাই বিপ্লবে (১৮৫৭ সালে) ইঁহার মৃত্যু হয়। সমাধি প্রস্তরে জীবন মৃত্যু এবং গুণাবলী সুবর্ণ অক্ষরে খোদিত করিয়া ইংরাজ-রাজ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন।

ঢোলপুর মহারাজাকে পরাজয় করিয়া ইংরাজ কর্ত্তৃক আনীত তাঁহার কামান দ্বয়ও এই স্থানে রক্ষিত হইয়াছে, দেখিলাম। আমাদিগের জাতি ছুরিকা গৃহে

রাখিতেও এখন স্বাধীন নহেন, তখন এত বড় কামানের মর্য্যাদা তাঁহারা বুঝিতে অবশ্যই অপারক কি অনভিজ্ঞ ছিলেন না। শুনিলাম, ঐরূপ সুন্দর কামান আপাতত নাকি পাওয়া যায় না।

দুর্গের মধ্যবর্ত্তী সমুদায় দর্শনীয় মনোহারিতা পরিদর্শন করিয়া সেই সমুদায় দৃশ্য পরিত্যাগ করিবার সময় আমরা সোমনাথে মন্দিরের শ্বেতচন্দন বিনির্ম্মিত বৃহৎ ভগ্নদ্বার দেখিতে গেলাম। এই জীর্ণ স্মৃতি একটী ভগ্নপ্রায় মলিন গৃহে ধূলি ধূসরিত ভাবে রহিয়াছে, কিন্তু তাহার সৌন্দর্য্য এখনও সম্পূর্ণ রূপে তিরোহিত হয় নাই। এই পবিত্র দ্বার সোমনাথের গৌরবের সাক্ষীরূপে জীর্ণতায়ও অদ্যাপি আপনার মহিমা প্রকাশ করিতেছে এবং যবনরাজ কর্ত্তৃক সোমনাথের ধ্বংশ ও অসংখ্য মণি মুক্তাদি আহরণের ইতিহাস স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

দিবাবসানের পূর্ব্বেই আমাদিগের অশ্বযান সেকেন্দ্রাভিমুখে প্রধাবিত হইল এবং অনতিবিলম্বে আমরা সেই সমাধিক্ষেত্রে গিয়া নামিলাম। সেকেন্দ্রা আগ্রা নগরীর বাহিরে, তবে অতি সামান্য দূর মাত্র। এখানে গাড়ী দেখিলেই মুসলমানগণ আপ্যায়িত করিতে দলে দলে আইসে কিন্তু সেই আত্মীয়তার বিনিময়ে অযাচিত অনুগ্রহের প্রতিদানে পয়সা দিতে হয়। সেকেন্দ্রাতে আকবর বাদসাহের ও তাঁহার অন্যান্য পারিজনবর্গের সমাধি রহিয়াছে। সেই সকল সমাধির অবস্থা এখন অতীব শোচনীয়। কাহারও মন্দিরভগ্ন, কাহারও প্রস্তর খণ্ডের স্বর্ণাক্ষর বিলুপ্ত, কাহারও বা সমাধিশয্যা সম্পূর্ণ ভাঙ্গিয়া ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে। চারিদিকে শ্মশানের হাহাকার এবং জনশূন্যতার নিস্তব্ধ রোদন, কি দেখিব, কি শুনিব, বুঝিতে পারিলাম না, কেবল দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত শ্মশানের সেই ভগ্ন চিত্র স্মৃতিতে মিশাইয়া গেল।

বাদসাহদিগের সমাধির একটু দূরে আর একটী সমাধি-সৌধ দেখিলাম, কিন্তু তাহার ভিতরে আমরা যাই নাই। সেই খানের লোকের মুখে শুনিলাম যে, এই "শীশমহল" মহারাজ মানসিংহের ভগ্নীর স্মরণার্থ সংস্থাপিত এবং তাঁহার ভগ্নাবশেষ উক্ত মন্দির-হৃদয়ে যত্নে সমাধিতলে প্রোথিত করা হইয়াছে। এই জনশ্রুতি কতদূর সত্য, তাহা আমি বলিতে পারি না।

আকবর বাদসাহের সমাধির পার্শ্বে তাঁহার ধাত্রী-পুত্রের সমাধি রহিয়াছে। ধনী মুসলমানগণ ধাত্রীর স্তন্যদুগ্ধে নাকি প্রতিপালিত হন। সেই জন্য তাঁহারা ধাত্রীকে মাতৃ সম জ্ঞান করিয়া তাহার পুত্রকে সহোদরের ন্যায় স্নেহ ভক্তি করিয়া থাকেন। সম্রাট আকবর পরম ধার্ম্মিক ছিলেন, সুতরাং তাঁহার সকল কাজই প্রীতিকর এবং উল্লেখযোগ্য বলিয়া বোধ হয়।

আমরা এই সমাধির অট্টালিকার উপর হইতে ফতেপুর শিকড়ির দৃশ্য কতক কতক দেখিলাম। কিন্তু চর্ম্ম চক্ষে তত রূপ দেখা গেল না, "দূরবীক্ষণের চক্ষে" দেখিলে হয়ত আরও সুন্দরতর দেখাইত। দুর্ভাগ্যক্রমে আমার নিকট দূরবীক্ষণ ছিল না। সুতরাং "যন্ত্রহীন বিধাতা-নির্ম্মিত চারু মানবনয়নে" যাহা দেখা সম্ভব, তাহাই দেখিয়া, পরিতৃপ্ত মনে, সায়াহ্ন সমীরণ সেবন করিতে করিতে বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দিবা-ক্লান্তি দূর করিলাম।

কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ সাভিফা

[* ইতমৎ-উদ-দৌলা - সম্রাট জাহাঙ্গীরের পত্নী নূরজাহানের পিতা মির্জা গিয়াসউদ্দিনের সমাধি। ভারতে প্রথম লাল বেলে পাথরের পরিবর্তে শ্বেতপাথরে তৈরি সমাধি সৌধ - কথিত যে এটিই পরবর্তীতে তাজমহল নির্মাণের অনুপ্রেরণা। - সম্পাদক]

tell a Friend

ধারাবাহিক ভ্রমণকাহিনি - হিমালয়ের ডায়েরি (তৃতীয় পর্ব)

আগের পর্ব - ফুলের দেশে কিছুক্ষণ

বদ্রীনারায়ণ থেকে মানা ও বসুধারা

সুবীর কুমার রায়

পূর্বপ্রকাশিতের পর -

পরটাগুলো গরম করে নিয়ে কফির সঙ্গে খেতে ভালই লাগল। মাধব গিয়ে কম্বলগুলো গুরুদ্বোয়ারা কর্তৃপক্ষকে ফেরৎ দিয়ে, আমাদের জিনিসগুলো নিয়ে এল। দোকানে বসেই ঘাংরিয়া গুরুদ্বোয়ারার একটা ছবি নিলাম। কয়েকজন মিলিটারি, দোকানের বাইরে দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছে। অনেকদিন বাড়ি ছেড়ে বেরিয়েছি। গোটা পৃথিবীর কোন খবর আমরা এতদিন পাইনি। ওদের হাতে রেডিও দেখে খবর জিজ্ঞাসা করলাম, ওরা জানাল, প্রধান মন্ত্রী চরণ সিং পদত্যাগ করেছেন। ওসব খবর তখন মোটেই মুখরোচক মনে হল না। দাম মিটিয়ে গোবিন্দঘাটের উদ্দেশ্যে হাঁটতে শুরু করলাম। নন্দন কানন থেকে ফিরবার পথে চারজন যুবকের সাথে দেখা হয়েছিল। তারা বোধহয় হেমকুণ্ড সাহেব পরে যাবে। তাদের একজনের হাতে দেখলাম, সাদা বেশ কয়েকটা কাগজ যত্ন করে পলিথিন পেপারে মোড়া। আলাপ হলে জিজ্ঞাসা করেছিলাম এই কাগজগুলো কী জন্য নিয়ে যাচ্ছে। উত্তরে একজন বলেছিল, এগুলো ব্লটিং পেপার, এটা দিয়ে মুড়ে ব্রহ্মকমল নিয়ে যাবে। তাতে নাকি ফুল অনেকদিন টাটকা থাকে। আমি হেসে বললাম, 'মৌয়া গাছের মিষ্টি ছায়া ব্লটিং দিয়ে শুষে, ধুয়ে মুছে সাবধানেতে রাখছি ঘরে পুষে', গোছের ব্যাপার বলছেন। সত্যিই কী ব্লটিং পেপারে মুড়ে রাখলে, ফুল অনেকদিন ভাল ও টাটকা থাকে? ওরা বলল তাই শুনেছে। বললাম, নন্দন কাননে কিন্তু ব্রহ্মকমল পাবেন না, ব্রহ্মকমল নিতে গেলে হেমকুণ্ড সাহেব যেতে হবে। ওরা তবু বললো না না, নন্দন কাননেই তো আসল ব্রহ্মকমল পাওয়া যায়। বললাম দু-দু'বার ঘুরে আসলাম, আসল নকল একটাও তো চোখে পড়ে নি। দেখুন চেষ্টা করে, বেষ্ট অফ লাক। এখন হঠাৎ ওদের কথা এসে পড়ায়, দিলীপ বলল, আগে জানলে ব্লটিং পেপার নিয়ে আসতাম। একে ব্রহ্মকমল খুব একটা বেশি নেওয়া হয় নি, তাও আবার যদি ভাল না থাকে, তবে দুঃখের শেষ থাকবে না।

সকালবেলা তীরথ চলে যাওয়ার আগে, আমাদের একটা পলিথিন ব্যাগে করে, ওদের বাড়িতে তৈরি ঘিয়ে ভাজা আটার মতো এক প্রকার খাবার দিয়ে গেছে। রাস্তায় খবর পেলাম বিকেল চারটের সময় শেষ বাস পাওয়া যাবে। হাতে সময় খুব অল্প। কোন দোকানে চা পর্যন্ত না খেয়ে, তীরথের দেওয়া নতুন খাবার মুখে পুরে, আমরা প্রায় ছুটে নেমে চলেছি। হেমকুণ্ড, নন্দন কানন থেকে ফিরছি বলে, পথে হেমকুণ্ডগামী পাঞ্জাবীরা আমাদের সাথে কথা বলছে, খোঁজখবর নিচ্ছে। অল্প কথায় আলাপ সেরে, আবার সামনে এগিয়ে চলেছি। জঙ্গলচটিতে এসে আমরা চা খেলাম, সঙ্গে তীরথের দেওয়া আটাভাজা। জিনিসটা নতুন হলেও, খেতে বেশ ভালই। এখানে আবার শুনলাম বদ্রীনারায়ণ যাবার বাস, পৌনে পাঁচটার সময় পাওয়া যাবে। বুকে নতুন আশা নিয়ে দাম মিটিয়ে ছুটলাম। একনাগাড়ে নীচের দিকে নামতে নামতে, পাগুলো বেশ ব্যথা করছে। যতদূর দৃষ্টি যায় দেখবার চেষ্টা করছি নীচের গুরুদ্বোয়ারা দেখতে পাওয়া যায় কী না। এখনও কিছু নজরে পড়ে নি। আরও কিছু পথ চলার পর, হঠাৎ দূরে, বহুদূরে, আমাদের আকাঙ্খিত গুরুদ্বোয়ারার দেখা মিলল। এবার আমাদের হাঁটার গতি আরও বেড়ে গেল। সবকিছু ঠিক থাকলে, আজই আমরা বদ্রীনারায়ণ পৌঁছচ্ছি। শেষ পর্যন্ত গুরুদ্বোয়ারার সামনে এসে হাজির হলাম। সামনে কয়েকজন পাঞ্জাবী বসে আছে। তীরথকে দেখলাম না। সময় নষ্ট না করে, দোতলায় মাল রাখার ঘরে গেলাম। বাইরে থেকে দরজায় তালা ঝুলছে। এদিকে প্রায় সাড়ে চারটে বাজে। দৌড়ে গেলাম কুলি ডাকতে। একজন কুলির কাছেই জানতে পারলাম, এক পাঞ্জাবীর কাছে মাল রাখার ঘরের চাবি থাকে, এবং সে বাস রাস্তায় গেছে। মাধবকে ডুপ্লিকেট চাবি কার কাছে থাকে জেনে মাল নেওয়ার ব্যবস্থা করতে বলে, ছুটলাম বাস রাস্তার দিকে। কুলিটা জানালো সেই পাঞ্জাবীটি মিলিটারি রঙের জামা ও পায়জামা পরে আছেন। মাধবকে বললাম, ভদ্রলোককে খুঁজে পাঠিয়ে দিচ্ছি আর রাস্তায় বাস থামাবার জন্য অপেক্ষা করছি। দেখি যদি অনুরোধ করে বাসটাকে পাঁচ-সাত মিনিট বেশি সময় দাঁড় করানো যায়। বাস রাস্তায় যাবার পথেই পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। হাতজোড় করে তাঁকে তাড়াতাড়ি ঘর খুলে মালপত্র বার করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলাম। এও জানালাম যে আমার দু'জন সঙ্গী গুরুদ্বোয়ারায় কুলি নিয়ে অপেক্ষা করছে। তিনি সম্মতি জানিয়ে জোর কদমে গুরুদ্বোয়ারার দিকে পা চালালেন। খানিক বিরক্তিও লাগছিল যে তীরথ আমাদের জন্য অনেক করছে ঠিকই, কিন্তু বাধ্যতামূলকভাবে এই গুরুদ্বোয়ারায় থাকাটা ভালোলাগছিলনা, অনেকটা ওদের মতো করেই চলতে হচ্ছিল। তীরথের দেখা না পেয়ে যেন একটু স্বস্তিই পেলাম, মনে হল বদ্রীনারায়ণ গিয়ে নিজেদের পছন্দ মতো যেকোন হোটেলে ওঠা যাবে। আর আমাদের গুরুদ্বোয়ারায় মালপত্র নিয়ে লাইন দিয়ে উদ্বাস্তুদের মতো রাত কাটাতে হবে না। এইসব ভাবতে ভাবতে বাস রাস্তায় এসে, সামনে তাকিয়ে চমকে উঠলাম। তীরথ দাঁড়িয়ে। ওর মা, বোন ও ভগ্নীপতি একটা চায়ের দোকানে বেঞ্চে বসে আছেন। তীরথ আমায় দেখেই প্রায় ছুটে এসে, নন্দন কানন সম্বন্ধে নানারকম প্রশ্ন করতে শুরু করে দিল। ওকে জুতো হারানোর গল্প বললাম। ওর মাকে নিজের ভাষায় ঘটনাটা বলল। নতুন নতুন ফুল কী কী দেখেছি, এবং কবরখানার কথা বলতে, ও এগুলো দেখতে না পাওয়ার জন্য আফসোস করে বলল, গতকাল আর একটু কষ্ট করে এগিয়ে গেলেই ভাল হত। ও আজ এখানেই থাকবে বলে স্থির করেছিল। কিন্তু ভগ্নীপতি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায়, আজই বদ্রীনারায়ণ যাচ্ছে। কাল ভোরে গরমকুণ্ডে স্নান সেরে দেশের উদ্দেশ্যে রওনা দেবে। ও চলে যাচ্ছে, এবং কেন চলে যাচ্ছে জানিয়ে, গুরুদ্বোয়ারায় একটা চিঠি লিখে রেখে এসেছে, আমাদের দেওয়ার জন্য।

ব্যাস গুহা

অনেকক্ষণ সময় কেটে গেল, মাধবদের পাত্তা নেই। তীরথকে বললাম, একটু এগিয়ে দেখি। ও বলল, চিন্তা কোরো না, ওরা ঠিক সময়ে চলে আসবে। একটু পরেই অনেক দূরে মাধব, দিলীপ ও কুলিকে লাইন দিয়ে আসতে দেখা গেল। সবার জন্য চায়ের অর্ডার দিয়ে, এগিয়ে গিয়ে মাল নিলাম। হাল্কা বৃষ্টি শুরু হওয়ায়, দাঁড়িয়ে থাকা একটা গাড়ির তলায় মালপত্রগুলো ঢুকিয়ে রাখলাম। চা দিয়ে গেল। একটাও চুমুক দেবার আগেই বাস এসে গেল। চা ফেলে রেখে বাসের ছাদে উঠে মালপত্র সাজিয়ে রাখলাম। কুলির পয়সা দিতে গিয়ে দেখা গেল খুচরো নেই। তীরথের বোনের কাছ থেকে দুটো টাকা নিয়ে, কুলিকে বিদায় করলাম। আমি ও মাধব বাসের ছাদে মাল তোলায় ব্যস্ত ছিলাম। মালপত্র তুলে রেখে এসে দেখি, তীরথের মা আমাদের জন্য কাপড় পেতে বসার জায়গা সংরক্ষণ করে রেখেছেন। আমরা সবাই বাসে বসার জায়গা পেলাম। বদ্রীনারায়ণ পর্যন্ত বাস ভাড়া মাত্র দু টাকা পঁচাত্তর পয়সা। তীরথ আমাদের বাস ভাড়াও দিতে গেল। আমরা কিছুতেই রাজী না হওয়ায় বলল, ঠিক আছে, তাহলে তোমরা তোমাদের ভাড়া দাও, আমি আমাদের চারজনের ভাড়া দিচ্ছি।

বাস ছেড়ে দিল। আগামীকাল সকালের পর আর আমাদের কোন দিন দেখা হবেনা বলে, তীরথের মা খুব দুঃখ প্রকাশ করলেন। বললাম মন খারাপ করবেন না। পৃথিবীটা গোল, একদিন না একদিন আবার দেখা হবেই। তাছাড়া কোনদিন পাঞ্জাবে যাওয়ার সুযোগ আসলে আপনাদের ওখানে তো যাবই। খুব খুশী হয়ে বললেন, তোমাদের যতদিন ইচ্ছে, আমার ওখানে প্রেমসে থাকতে পার। তীরথ এবার বললো, রায় তুমি তো গান জান। সামনেই আমার বিয়ে। তুমি তোমার বন্ধুদের নিয়ে আসবে, হারমোনিয়াম বাজাবে। নতুনদার সাথে কোথায় যেন নিজের মিল খুঁজে পেলাম। একটু থেমে, তীরথ হঠাৎ বলল, যদি কিছু মনে না করো তো একটা কথা বলতাম। তোমরা তিনজনে যাবে অনেক জায়গা। হেলং এর মতো পথে আরও বিপদ আসতে পারে। আমার কাছে যথেষ্ট টাকা আছে, প্রয়োজন হলে কিছু রেখে দাও। পরে কোন কারণে প্রয়োজন হলে আর আমার সঙ্গে দেখা হবে না, বিপদে পড়বে। ওর মাও বললেন তীরথের থেকে কিছু টাকা নিয়ে রেখে দাও বেটা। তাঁকে বললাম, কথাটা শুনে খুব ভাল লাগল। আমাদের টাকার আর প্রয়োজন হবে না, ধন্যবাদ। তবু তীরথ আবার বলল, নাহয় ধার হিসাবেই রাখ, বাড়ি ফিরে গিয়ে ফেরত দিয়ে দিও। ওকে জানালাম, আমরা প্রয়োজনের বেশিই টাকা নিয়ে এসেছি, দরকার হবে না। এবার তীরথের বোনকে কুলিকে দেওয়া টাকা দুটো ফেরত দিতে গেলে, ও কিছুতেই নেবে না। বলল, মাত্র দুটো টাকা, তাও ফেরত দেবে? ভাইয়ার কাছ থেকে ও টাকা আমি ফেরত নিতে পারব না। কী বিপদ, এরা আমাদের ভেবেছেটা কী? বললাম টাকা ভাঙানো ছিলনা বলে নিয়েছিলাম, ফেরত না নিলে খুব দুঃখ পাব। ও আর কথা না বাড়িয়ে টাকাটা নিয়ে নিল।

তীরথ বলল আজ রাতটা ওরা বদ্রীনারায়ণে কোন একটা ভাল হোটেলে উঠবে, আমরা যেন একই হোটেলে উঠি। কিছু না বলে চুপ করে বসে, সামনের দিকে উদাসভাবে তাকিয়ে রইলাম। সন্ধ্যাবেলা বাস এসে বদ্রীনারায়ণ পৌঁছলো। কুলিরা ছুটে এল। একজন পাণ্ডা পরিস্কার বাংলায় আমাদের বলল তার ওখানে উঠতে। মন্দিরের পাশেই সে থাকে। জিজ্ঞাসা করলাম, মন্দিরটা কোথায়? হাত তুলে দূরে দেখাল। ঘন কুয়াশায় কিছুই দেখা গেল না। পাণ্ডা বলল, আপনারা বাঙালি বলেই বলছি। কথা শুনে বুঝতে পারছি, বাংলা বললেও বাঙালি নয়। ব্যবসার খাতিরে বাংলাটা শিখেছে। কত টাকা দিতে হবে জিজ্ঞাসা করায় বলল, আমাদের যা ইচ্ছা দিলেই হবে। নাম জিজ্ঞাসা করায় সে জানাল, 'পঞ্চভাই' বললে এখানে যে কেউ তাকে দেখিয়ে দেবে। জানিনা পাঁচ ভাই মিলে পার্টনারশিপ ব্যবসা ফেঁদেছে কী না। এবার তীরথকে বললাম যে ওরা তো সকালেই চলে যাবে, কিন্তু আমরা এখানে তিন-চার দিন থাকব। দামী হোটেলে তিন-চার দিন থাকা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। কাজেই আজ আমরা এই ভদ্রলোকের বাড়িতেই উঠি। পছন্দ না হলে কাল অন্য কোথাও ঠিক করে নেওয়া যাবে। তারা যেন কিছু মনে না করে। কাল প্রথম বাসে তাদের হৃষিকেশ যাওয়ার সময় আমরা এসে, তাদের বিদায় জানিয়ে যাব। তীরথ কুলির হাতে মালপত্র দিয়ে, মা, বোন আর ভগ্নীপতিকে নিয়ে এগিয়ে গেল।

বদ্রীনারায়ণ - তখন

পঞ্চভাই-এর সঙ্গে একটা বাচ্চাছেলে এসেছিল। সম্ভবত ওর অ্যাসিস্ট্যান্ট। কুলির হাতে মালপত্র দিয়ে, তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমরাও এগোলাম। মাধবের লাঠির নালটা আলগা হয়ে গিয়েছিল। কুলিটা লাঠিগুলোর ওপর ভর দিয়ে হাঁটছিল। মাধবকে বললাম লাঠিগুলো ওর হাত থেকে নিয়ে নিতে। ও বলল, থাক কিছু হবে না। মন্দিরে এসে পৌঁছলাম। ও বাবা, এ তো রীতিমতো শহর। মন্দিরের সঙ্গেই ডানপাশে বিরাট একটা হোটেল। দুটোর মাঝখান দিয়ে সিঁড়ি ভেঙ্গে আমাদের যেতে হবে। পাশের একটা দরজা দিয়েও মন্দিরে ঢোকা যায়। একটু ওপরেই পঞ্চভাই-এর আস্তানা। একটা ঘেরা বারান্দা, শতরঞ্চি পাতা আছে। একজন মোটাসোটা যুবক ও একজন বৃদ্ধ তাতে বসে গল্প করছে। তাদের পাশ দিয়ে পরপর দুটো ঘরের দ্বিতীয়টায় গিয়ে ঢুকলাম। ছোট ঘর, দুটো দরজা একটা জানালা। একটা দরজা দিয়ে বারান্দায় বেরোতে হয়। অপরটা পাশের ঘরে যাওয়ার। এই দরজাটা বন্ধ। বুঝলাম বাইরে বসে থাকা দুজন ঘরটা নিয়েছেন। পাশের ঘর থেকে ঘন ঘন কাশির আওয়াজ আসছে। তার মানে ওরা সংখ্যায় তিনজন। আমাদের ঘরটা ভালই। যারা বাইরে যাওয়া বলতে শুধুই বিলাসবহুল হোটেলের ঘর বোঝেন, তাদের কথা বলতে পারব না। কিন্তু আমাদের মতো যারা এপথে শুধু দেখতেই এসেছে, এবং ঘর বলতে রাতের নিশ্চিন্ত আশ্রয় বোঝে, তাদের জন্য ঠিক আছে, অন্তত আমাদের চলে যাবে। যাহোক, পঞ্চভাই লেপ এনে দিল। আমাদের মালপত্র তাকে গুছিয়ে রাখলাম। বারান্দায় আসতেই ওরা জিজ্ঞাসা করল আমরা কোথা থেকে আসছি। আমরা আজকের সমস্ত ঘটনা বলে বললাম, আজ বদ্রীনারায়ণের বাস ধরবার জন্য প্রায় ছুটে ছুটে আসার জন্যই বোধহয় পায়ে বেশ ব্যথা হয়েছে। পায়ে ব্যথার কথা শুনেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক বললেন, তাহলে আর এখানে বসা যাবে না। কেন বসা যাবে না জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বললেন ইয়ং ছেলে, এইটুকু পথ হেঁটেই পায়ে ব্যথা হয়ে গেল? যুবকটির থেকে জানলাম, বৃদ্ধ তার কেউ হয় না। একতলায় একটা ঘর নিয়ে থাকেন। ন'বছর বাড়ি ছাড়া হয়ে, হিমালয় দর্শন করে বেড়াচ্ছেন। বৃদ্ধকে বললাম, এপথে আসার জন্য শারীরিক শক্তি কোন কাজে লাগে না। মনোবলই সব। বাড়ি কোথায় জিজ্ঞাসা করাতে, তিনি বলতে চাইলেন না। পরে জেনেছিলাম তাঁর বাড়ি নদীয়া জেলায়। ভদ্রলোকের পায়ের পাতায় বিরাট বিরাট ঘা, লাল রঙের ওষুধ লাগানো আছে। শুনলাম জোঁকের আক্রমণে এই অবস্থা হয়েছে। দুমাস হাসপাতালেও ছিলেন। একটু পরেই ভদ্রলোক একতলায় চলে গেলেন। যুবকটি বলল, তার বাড়ি বর্দ্ধমানের মেমারীতে। সোনার দোকান আছে। তারা কেদারনাথ যাওয়ার উদ্দেশে রওনা দিয়ে রাস্তার ধ্বসের জন্য বাস যেতে না পারায়, বদ্রীনারায়ণ চলে এসেছে। আমরা এখান থেকে কেদারনাথ যাব শুনে, সেও একসঙ্গে যেতে চাইল। তার এক কর্মচারী আছে, তাকে খচ্চর ভাড়া করে দেবে।

একবার বাইরে যাওয়ার জন্য নীচে নেমে দেখি, একতলার বৃদ্ধটি ওই ঠাণ্ডায় বাসন ধুচ্ছেন। তিনি আমাদের এখানে কী কী দেখবার আছে জানালেন। মন্দিরে এলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই চন্দন চর্চিত বদ্রীবিশালকে সম্পূর্ণ নগ্ন করে, নতুন বস্ত্র পরানো হ'ল। তাঁর গলার পুরাতন মালার চাহিদা দেখলাম খুব। উপস্থিত সমস্ত ভক্তই হাত বাড়িয়ে মালা বা ফুলের টুকরো নিতে চাইছে। মূর্তির মাথার মুকুটটা দূর থেকে দেখলেও চোখ ঝলসে যাবে। শুনলাম ওটার মূল্য নাকি এক কোটি টাকা। হতেই পারে, মন্ত্রীদের যেখানে কোটি টাকার সম্পত্তি থাকে, নারায়ণের থাকতে আপত্তি কোথায়?

তপ্তকুণ্ড - বদ্রীনাথ

কালো পোশাক পরা এক পুরোহিত পুজোর সব কাজ করছেন। সামান্য আরতির মত হল। শুনলাম এবার মন্দিরের দরজা বন্ধ করা হবে। আমাদের সঙ্গে পঞ্চভাই পাণ্ডাও মন্দিরে গিয়েছিল। তার চেষ্টায় সবার আগে দাঁড়াবার সুযোগও পেয়েছিলাম। কয়েকজন লোক মূর্তির অনতিদূরে - আমাদের আর মূর্তির মাঝখানে বসে। তারা নাকি ভি.আই.পি. মানুষ। একজন লম্বা চওড়া লোক মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করল - সঙ্গে বডিগার্ড। শুনলাম ইনি একজন ভি.ভি.আই.পি.। মন্দিরে এই আলাদা ব্যবস্থা দেখব আশা করি নি। পাঞ্জাবীদের কোন গুরুদ্বোয়ারায় এ রকম দেখি নি। অথচ দেশে শিখ ধর্মাবলম্বী ভি.ভি.আই.পি-র অভাব আছে বলে তো মনে হয় না। জয় বদ্রীবিশাল কী জয়। মন্দিরের বাইরে বেরিয়ে এলাম।

ঘরে ফিরে ঠিক করলাম আগামীকাল সকালে ভারতের শেষ গ্রাম, 'মানা'র ওপর দিয়ে 'বসুধারা' যাব। একতলার সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক বললেন, বেশ কয়েক কিলোমিটার দূরে শতপন্থ লেক। খুব সুন্দর জায়গা, তবে ওখানে যেতে গেলে চামোলী থেকে অগ্রিম অনুমতি পত্র নিয়ে আসতে হয়। জানা ছিলনা, তাই আর যাওয়ার চেষ্টা করে লাভ নেই। একটু পরে মন্দিরের পাশের দোকানে রুটি, তরকারি খেতে গেলাম। দেখা হল ঘাংঘারিয়ার সেই বাঙালি ভদ্রলোকের সঙ্গে, যিনি আমাদের ভাঙ্গা গ্লেসিয়ার আর নদীর কথা বলেছিলেন। তাঁর সঙ্গে হেমকুণ্ডে সাঁতার কাটতে দেখা সেই জাপানি ছেলেটিও রয়েছে। দুজনেরই কোন সঙ্গী না থাকায় একসাথেই রয়েছেন শুনলাম। বাঙালি ভদ্রলোকটির বাড়ি মধ্যপ্রদেশে, ভারত হেভি ইলেকট্রিক লিমিটেড-এ কাজ করেন। আমরা নন্দন কাননের ভাঙ্গা গ্লেসিয়ারটা পার হয়ে গেছিলাম কী না জিজ্ঞাসা করায়, তাঁকে আমাদের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা বললাম। এঁর উল্টো দিকের চেয়ারে আর এক ভদ্রলোক বসেছিলেন। তাঁকে দেখতে অনেকটা বাঙালিদের মতোই। উনি ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করলেন, আমরা কী বলছি। বুঝলাম ইনি বাঙালি নন। আমাদের পরিচিত ভদ্রলোক তাঁকে সমস্ত ঘটনা বলাতে, তিনি বললেন, খুব রিস্ক নিয়েছিলেন। দেশের জন্য, দশের জন্য লোকে প্রাণ দেয়, আপনি তো একটা জুতোর জন্য প্রাণ দিতেন!

একুশে আগষ্ট। সকালে ঘুম থেকে উঠে গেলাম তপ্তকুণ্ডে স্নান করতে। তিনজনে মাঝখানের চৌবাচ্চাটার জলে নামলাম। ডানপাশে মন্দিরের দিকে মুখ করে বসলে, জলের মধ্যে এক কোণে একটা সিমেন্ট বা পাথরের স্ল্যাব আছে। ওটায় সুন্দর বসে থাকা যায়। মাধব আর দিলীপ একটু পরেই মন্দিরে পুজো দিতে গেল। আমি গরম জলে বসে গায়ের ব্যথা কমাতে লাগলাম। সেই বাঙালি ভদ্রলোক ও জাপানি ছেলেটি এসে হাজির হল। বাঙালি ভদ্রলোক গরম জলে নামলেন। আর কিছুক্ষণ কাটিয়ে, জল থেকে উঠে জাপানি ছেলেটিকে প্রশ্ন করলাম, কেন জলে নামছে না? ইংরেজিতে কথা বললেও, 'থাওল থাওল' বলে সে কী যে বলতে চাইছে, বুঝতে পারছি না। হঠাৎ বুঝলাম ওর সঙ্গে টাওয়েল নেই। বললাম, ওর সঙ্গীর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে স্নান করতে, শরীর একবারে সুস্থ হয়ে যাবে। কাঁধের ঝোলা ব্যাগ থেকে তাকে একটু আমসত্ত্ব দিলাম। চোখ বুজে খাওয়া দেখে বুঝলাম, বস্তুটির সঙ্গে তার আগে পরিচয় না থাকলেও, আমসত্ত্ব তাকে যথেষ্ট তৃপ্ত করেছে। বেশ কিছুক্ষণ পরে ঘরে ফিরে দেখি, আমার সঙ্গী দুজন তখনও ফেরেনি। কিছুক্ষণ পরে তারা প্যাকেটে করে প্রসাদ নিয়ে ফিরে এল। আমরা মন্দিরের পাশে হোটেলে গেলাম। ওরই বাঁপাশ দিয়ে বসুধারা যাবার রাস্তা। এখানে দেখি ধোসাও পাওয়া যায়। গরম গরম ধোসা আর চা খেয়ে আমরা রওনা দিলাম। আগের দিনের সেই যুবকটিও আমাদের সঙ্গী হল।

এখান থেকে তিন কিলোমিটার দূরে ভারতের শেষ গ্রাম 'মানা'। মন্দিরের বাঁপাশে, অর্থাৎ হোটেলটার কাছে একটা নোটিশ বোর্ডে লেখা আছে - বিদেশিদের ওই নোটিশ বোর্ডের ওপারে যাওয়া নিষেধ। জানলাম চামোলী থেকে অনুমতি পত্র আনলে বিদেশিদের বসুধারা যেতে দেওয়া হয়। জাপানি ছেলেটির আর বসুধারা দেখা হল না। যাওয়ার পথে অনেকে বলল, ক্যামেরা নিয়ে বসুধারা যেতে দেওয়া হয়, আবার অনেকেই বলল, যেতে দেওয়া হয় না। আমাদের সঙ্গে অতি সাধারণ একটা ভারতীয় ক্যামেরা। সেটা গলায় ঝুলিয়ে নিয়ে চললাম। ডানপাশে মিলিটারি আড্ডা, প্রচুর ঘোড়া ও ট্রাক দাঁড়িয়ে। একটা ব্রিজ পার হয়ে ওখানে যেতে হয়। একসময় আমরা মানা গ্রামে এসে হাজির হলাম। কেউ কিন্তু ক্যামেরা চাইল না। অনেকগুলো বাচ্চা পিছন পিছন পয়সার জন্য আসছে। শুনলাম এখান থেকে উনচল্লিশ কিলোমিটার দূরে তিব্বত বর্ডার।

বসুধারা ও মানার পথে

একটু এগোতেই ছোট একটা মিলিটারি ক্যাম্প। আমাদের থেকে যুবকটি একটু এগিয়ে গিয়েছিল, ও দেখলাম দাঁড়িয়ে আছে। কাছে যেতে আমার গলায় ঝোলানো ক্যামেরাটা মিলিটারিরা চেয়ে নিল। ওরটা আগেই নিয়েছে। আরও বেশ খানিকটা পথ হেঁটে আমরা ভীমপুল এসে পৌঁছলাম। সরু নদী, কিন্তু ভীষণ তার গতি। অসম্ভব রকম গর্জন করে বয়ে যাচ্ছে। নদীর দুপারের দুটো বড় পাথরের উপর একটা বিশাল পাথর যেন শুইয়ে রাখা হয়েছে। একটা দশ-বার ফুটের ব্রিজ বা পুল। ব্রিজের বেশ খানিকটা নীচ দিয়ে সেই ভয়ঙ্কর নদী বয়ে যাচ্ছে। নীচে নদীর দিকে তাকালে মাথা ঘুরে যায়। আসবার পথে শুনেছি এটা নাকি সরস্বতী নদী। মহাপ্রস্থানের পথে যাবার সময় ভীম এই বিশাল পাথরটা ফেলে, এই পুল তৈরি করেন। যাহোক, ওখানে বসে ভাবছি সরস্বতী নদী কী সারা দেশের ওপর দিয়েই বয়ে গেছে? তাহলে সর্বত্র তার স্বাস্থ্য এত খারাপ কেন? এই ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে কী ভাবেই বা সে এতটা পথ পাড়ি দেয়? এখানে এই ভয়ঙ্কর নদীর ওপর কী অদ্ভুত একটা ব্রিজ! কত কম খরচে নদীর ওপর ব্রিজ তৈরি করা যায়, এখনকার বড় বড় ইঞ্জিনিয়ারদের ভীমের কাছ থেকে শেখা উচিত। কোনরকম রক্ষণাবেক্ষণ খরচ ছাড়াই, যুগের পর যুগ দিব্যি ব্যবহারযোগ্য হয়ে টিঁকে আছে।

সরস্বতী নদী

এমন সময় সেই বাঙালি ভদ্রলোক গলায় এক দামী বিদেশি ক্যামেরা ঝুলিয়ে এসে হাজির হলেন। আমরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি কী ভাবে ক্যামেরা নিয়ে এখানে এসেছেন। তিনি তো আমাদের কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। বললেন, এই ভাবেই গলায় ক্যামেরা ঝুলিয়ে সোজা এখানে এসেছেন। পথে এক মিলিটারি তাঁর সঙ্গে আলাপও করেছে। কিন্তু কেউ তাঁকে ক্যামেরা রেখে যেতে বলেনি। দিলীপকে বললাম, তার মানে ক্যামেরা নিয়ে এখানে আসতে না দেওয়ার কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। আমরা দু'জনে আমাদের ক্যামেরা ফেরৎ আনতে আগের ক্যাম্পটার উদ্দেশ্যে ফিরে গেলাম। মাধব, আমাদের সঙ্গী যুবকটি ও বাঙালি ভদ্রলোক ভীমপুলে বসে থাকলেন। ক্যাম্পে এসে ওখানকার মিলিটারি প্রধানকে বললাম, "আমরা সাধারণ ভারতীয়, আমাদের সঙ্গের ক্যামেরাটাও অতি সাধারণ ভারতীয় ক্যামেরা। বহুদূর থেকে এখানে এসেছি। যদি অনুমতি দেন তাহলে ভীমপুল বা বসুধারার ছবি নিয়ে গিয়ে, বাড়ির লোকদের দেখাতে পারি"। ভদ্রলোক খুব শান্ত ও ভদ্রভাবে বললেন, বসুধারার ছবি তোলা গভর্ণমেন্টের কড়া বারণ। তাঁর কিছু করার নেই। আমরা জানালাম এক ভদ্রলোক ক্যামেরা নিয়ে ভীমপুলে অপেক্ষা করছেন, তাকে কেন নিয়ে যেতে দেওয়া হ'ল? মিলিটারি ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে তাঁর সঙ্গীদের ডাকলেন। ক্যাম্পের ভিতর থেকে দু'জন সঙ্গী বেরিয়ে এসে সব শুনেই, ঘোড়া নিয়ে ঐ বাঙালি ভদ্রলোককে ধরতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হ'ল। ভাবলাম কেন বলতে গেলাম। কিন্তু কথাটা বলে ভদ্রলোকের বোধহয় মঙ্গলই করেছি। নাহলে ফিরবার সময় তাঁর বিপদ হ'তই। আমি খুব শান্ত ভাবে নরম গলায় মিলিটারিদের বললাম, আমি গলায় ক্যামেরা ঝুলিয়ে বসুধারা যাচ্ছিলাম। আপনারা ক্যামেরাটা এখানে জমা রেখে যেতে বলেছেন, আমি জমা দিয়ে দিয়েছি। আমার মতো ওই ভদ্রলোকও তাঁর ক্যামেরা গলায় ঝুলিয়ে নিয়েই এখান দিয়ে গেছেন। ক্যামেরা নিয়ে যাওয়া নিষেধ বলে কোন নোটিশ বোর্ড কোথাও নেই, আপনারাও তাঁর কাছ থেকে ক্যামেরা চেয়ে নেননি। ফলে তিনি না জেনে ক্যমেরা নিয়ে গেছেন। আমার কাছে না চাইলে, আমিও তো ক্যামেরা নিয়েই চলে যেতাম। প্রথম যে মিলিটারি অফিসারের সঙ্গে আমরা কথা বলছিলাম, তিনি এবার বেশ কড়া সুরে বললেন "অসম্ভব, এদিক দিয়ে গেলে আমরা ক্যামেরা চেয়ে নিয়ে জমা রাখবই। ওপাশ দিয়ে আর একটা রাস্তা আছে, সে দিকেও একটা ক্যাম্প আছে। ওদিক দিয়ে গেলে, ওই ক্যাম্পের কর্মীরা ক্যামেরা জমা নিয়ে নেবে। ক্যামেরা ইচ্ছা করলে আপনারা নিয়ে যেতে পারেন, তবে রীলে কত নম্বর পর্যন্ত ছবি তোলা হয়েছে নোট করে রাখা হবে। ফিরবার পথে দেখে নেওয়া হবে নতুন করে আর কোন ছবি তোলা হয়েছে কীনা। যদি কেউ ভুলবশতঃ না জানিয়ে ক্যামেরা নিয়ে চলেও যায়, তার ক্যামেরা থেকে রীলটা খুলে নেওয়া হবে"। বললাম - আপনাদের যাওয়ার দরকার নেই। কোন সভ্য ভারতীয় ভারত সরকারের নিষেধ অমান্য করে না। ভদ্রলোককে আমি আপনাদের কথা বলে ছবি তুলতে বারণ করে দেব। আমার কথা শুনে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ওই ভদ্রলোক আমাদের লোক কী না, বা আমাদের সঙ্গে এসেছেন কী না। বললাম তিনি আমাদের লোক নন, আমাদের সঙ্গে আসেনওনি। তবে তিনি বাঙালি, আমাদের ভাষা বোঝেন। আমি বারণ করলে তিনি কখনই ওখানকার ছবি তুলবেন না। অফিসারটি এবার অনেকটা নরম হয়ে বললেন, ঠিক আছে, আমি যেন তাঁকে ওখানকার কোন ছবি তুলতে বারণ করি। চলে আসছিলাম, হঠাৎ মনে হ'ল ব্যাপারটা আরও একটু পরিস্কার করে নেওয়া প্রয়োজন। ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করলাম, ভদ্রলোক আমার কথায় কোন ছবি তুলবেন না কথা দিতে পারি। কিন্তু ফেরার পথে তাঁরা বিশ্বাস করবেন তো? পরে কোন ঝামেলা হবে না তো? অবিশ্বাসের প্রশ্ন থাকলে তাঁরা গিয়ে ভদ্রলোকের ক্যামেরা নিয়ে আসতে পারেন। অফিসারটি বললেন ঠিক আছে তাঁকে যেন ছবি তুলতে বারণ করে দেওয়া হয়। পরে কোনরকম ঝামেলা করা হবে না।

নীলকন্ঠ শিখর

ফিরে এসে দেখি মাধব ও যুবকটি আমাদের জন্য অপেক্ষা করে বসে আছে। কিন্তু ক্যামেরার মালিক অনেকক্ষণ আগেই ক্যামেরা নিয়ে বসুধারার উদ্দেশে যাত্রা করেছেন। মহা চিন্তায় পড়লাম। মাধবকে সব বললাম। মাধব জানাল, একটু আগে তিনি তাকে সামনে দাঁড় করিয়ে ভীমপুলের একটা ছবি তুলেছেন। কী করা উচিত ভেবে না পেয়ে, এগিয়ে চললাম। বেশ কিছুক্ষণ পরে, বহুদূরে নীল জ্যাকেট পরা ভদ্রলোককে দেখতে পেলাম। একবারে ফাঁকা রাস্তা। মাঝে মাঝে মানা গ্রামের লোকেরা যাতায়াত করছে। দূরে বরফাচ্ছাদিত একটা শৃঙ্গ চোখে পড়ছে। হাত নেড়ে চিৎকার করে ভদ্রলোককে দাঁড়াতে বললেও, তিনি শুনতে পেলেন না। ভাবলাম রাস্তায় ছবি তুললে স্থানীয় লোকেরা যদি লক্ষ্য করে, তবে তারা হয়ত মিলিটারি ক্যাম্পে খবর দেবে। তখন আমিও না এর মধ্যে জড়িয়ে পড়ি। যাহোক ভদ্রলোক বোধহয় হাঁপিয়ে গিয়ে একটা জায়গায় বসে পড়লেন। আমরা জোর পায়ে আরও এগিয়ে গিয়ে, চিৎকার করে তাঁকে অপেক্ষা করতে বললাম। শেষে কাছে গিয়ে সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম। ভদ্রলোক সব শুনে খুব ভয় পেয়ে গিয়ে বললেন, ইতিমধ্যে তাঁর দুটো ছবি তোলা হয়ে গেছে। একটা ভীমপুলে, আর একটা মাঝপথে। আর মাত্র একটা ছবি তুললেই এই ফিল্মটা শেষ হয়ে যাবে। তাঁকে আর কোন ছবি তুলতে বারণ করে বললাম, ফিরবার পথে ওরা জিজ্ঞাসা করলে সত্যি কথা বলতে। কোন কারণে অবিশ্বাস করে ফিল্ম খুলে ওয়াশ করলে তিনি খুব বিপদে পড়বেন। ভদ্রলোক বললেন, তার ওয়াশিং চার্জ দেওয়াই আছে। সেরকম হলে তিনি অনুরোধ করবেন ফিল্ম খুলে নিয়ে ওয়াশ করে আপত্তিকর ছবি রেখে দিয়ে, বাকী ফটো অন্তত নষ্ট না করে তাঁকে পাঠিয়ে দিতে। শেষ পর্যন্ত তাই ঠিক হল।

আবার এগিয়ে চললাম। বহুদূরে বসুধারা ফলস দেখা যাচ্ছে। কিন্তু যতই হাঁটছি, দূরত্ব একই থাকছে বলে মনে হচ্ছে। রাস্তা খুব একটা কষ্টকর না হলেও, হাঁটতে আর ভাল লাগছে না। মানা গ্রামে একটা বোর্ডে লেখা ছিল – বসুধারা পাঁচ কিলোমিটার। অর্থাৎ বদ্রীনারায়ণ থেকে বসুধারা আট কিলোমিটার পথ। কিন্তু রাস্তা যেন আর শেষ হতেই চায় না। অবশেষে বসুধারা প্রপাতের তলায় এসে হাজির হলাম। পাহাড়ের চুড়ায় ভেন্টিলেটারের মতো একটা গর্ত থেকে মিল্ক পাউডারের মতো সাদা জল পড়ছে। কোনকালে হয়তো পাহাড় বেয়েই জলের ধারা নামতো। মনে হয় পাহাড়ের ক্ষয়ের ফলেই এখন পাহাড়ের গা বেয়ে না পড়ে, ওপর থেকে সোজা তলায় জল পড়ছে। ওপর থেকে সরাসরি জল যেখানে পড়ছে, আর আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, সেখান পর্যন্ত সাদা গ্লেসিয়ার। পাশ দিয়ে গ্লেসিয়ারের ওপর গেলে, ফলস-এর ঠিক তলায় যাওয়া যায়। শুনেছি বসুধারার তলায় দাঁড়ালে গায়ে যদি জল না লাগে, তাহলে বুঝতে হবে সে পাপী। ঝরনার ঠিক নীচে দাঁড়ালে একটুও জল গায়ে না লেগে কী ভাবে নিচে পড়তে পারে ভেবে পেলাম না। মনে হ'ল তবে কী সারা দুনিয়ার মানুষই কোন পাপ কাজ করে নি? পাপের জন্য আদালতে বিচার-সাক্ষীর প্রহসনে অযথা সময় ও অর্থ নষ্ট না করে, এখানে জলের তলায় দাঁড় করিয়ে দিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। সে যাই হোক, গ্লেসিয়ার বেয়ে লাঠি নিয়ে খানিকটা উঠলাম। মাধবের লাঠি আগের দিন কুলির ধকল সইতে না পেরে, নালছাড়া হয়েছে। বুঝলাম লাঠি নিয়ে চেষ্টা করলে ওঠা যাবে, কিন্তু নেমে আসা খুব কঠিন হবে। পা হড়কে রাস্তার ওপর, যেখানে সবাই দাঁড়িয়ে আছে, সেখান দিয়ে গড়িয়ে নীচের চাষের জমিতে চলে যেতে হবে। আস্তে আস্তে সাবধানে নীচে নেমে এলাম। সঙ্গে আমসত্ত্ব আছে, সকলে মিলে খানিকটা খেলাম। ভাবলাম জাপানি ছেলেটাকে আর একটু খাওয়ালে হয়। একটু পরে আমরা ফিরবার পথ ধরলাম।

রাস্তায় কোন জলের ব্যবস্থা নেই। কাজেই ওই ঝরনার জলই একটু খেয়ে, এগিয়ে চললাম। মাধব, দিলীপ ও যুবকটি আস্তে আস্তে অনেক পিছিয়ে পড়ল। আমি ও ক্যামেরা কেলেঙ্কারির নায়ক, গল্প করতে করতে এগিয়ে চলেছি। একসময় যুবকটিও এগিয়ে এসে আমাদের দলে যোগ দিল। মাধব ও দিলীপ এত পিছনে পড়ে গেল, যে ওদের আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। মাধবের হাঁটুতে একটা ব্যথা হয়েছে। চিন্তা হ'ল কোন অসুবিধায় পড়ল কী না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর, ওদের আবার বহুদূরে দেখতে পেলাম। একসময় আমরা সেই মিলিটারি ক্যাম্পের কাছাকাছি চলে এলাম। কোনরকম ঝামেলা হলে আমিও মুশকিলে পড়তে পারি ভেবে কায়দা করে ওদের থেকে পিছিয়ে গেলাম। আমরা তিনজন যখন ক্যাম্পে এসে পৌঁছলাম, দেখলাম যুবকটি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। বাঙালি ভদ্রলোক তাঁর ক্যামেরা সমেত ভালভাবে ফিরে গেছেন। বুঝলাম কোন ঝামেলা হয় নি, মিলিটারিরা তাদের কথা রেখেছে। ক্যামেরা ফেরত নিলাম। পাশেই কয়েকজন বৃদ্ধা ভেড়ার লোম দিয়ে কম্বল বা ওই জাতীয় কিছু তৈরি করছেন। কয়েকটা বাচ্চা তাঁদের ঘিরে খেলা করছে। একজন বৃদ্ধা একটা বালতি নিয়ে এসে আমায় কী বললেন, বুঝতে পারলাম না। আবার জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বললেন, আমার ওয়াটার বটলটার কত দাম? আমাদের দেশে এগুলো সস্তা কী না? বললাম এটার দাম সাত টাকা। তিনি বললেন যে তিনি আমাকে সাতটা টাকা দিচ্ছেন, আমি যেন তাঁকে এটা দিয়ে দিই। আমি ইচ্ছা করলে তাঁর বালতিটা নিয়েও এটা তাঁকে দিতে পারি। এরকম যে কোন প্রস্তাব আসতে পারে, স্বপ্নেও ভাবি নি। বললাম আমরা আরও অনেক জায়গায় যাব। রাস্তায় খাবার জলের প্রয়োজন হবে। বালতি করেও জল নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। কাজেই আমি এটা তাঁকে দিতে পারছিনা বলে দুঃখিত। মানুষগুলির সরলতা দেখে অবাক লাগল।

বদ্রীনাথ থেকে নীলকণ্ঠ পর্বত

আবার হাঁটতে শুরু করে কিছুক্ষণের মধ্যেই মানা গ্রামে এসে উপস্থিত হলাম। আই.টি.বি. পুলিশ ক্যাম্পের উল্টো দিকের একটা চায়ের দোকানে বসে অন্ততঃ বছর কয়েকের পুরনো চানাচুর কিনে, চা করতে বললাম। চানাচুরই এই দোকানের একমাত্র খাদ্যবস্তু। আমরা চায়ের অপেক্ষায় বসে আছি। বসে আছে আই.টি.বি. পুলিশে পোস্টেড দু'জন ভদ্রলোক। একজনের বাড়ি বেনারস, অপরজন বিহারের লোক। তারা আমাদের সব কথা শুনে বলল, আমাদের ক্যামেরাটা জামার তলায় ঢুকিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। ওপর থেকে দেখা না গেলে, কেউ সার্চ করতো না। ভাবলাম একই কাজে নিযুক্ত দু'জন কী চমৎকার দু'রকম কথা বলছে। ধন্য আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা! সাহস একটু বেড়ে গেল। পুলিশ ক্যাম্পকে সাক্ষী রেখে, দূরের গ্রামের ছবি নিলাম। দোকানদার এখনও চা তৈরি করছে। হঠাৎ দেখি পাথরে থেঁতো করে, সে কী যেন চায়ের কেটলিতে দিয়ে দিল। পরিমাণেও অনেকটা। জিজ্ঞাসা করতে দোকানদার জানাল, মশলা। ভাবলাম এখানকার অনেক চায়ের দোকানের মতো, এলাচ বা গরম মশলা জাতীয় কিছু দিয়েছে। ও বাবা! চায়ে একটা চুমুক দিয়েই অবস্থা শোচনীয়। খাবে কার সাধ্য! একগাদা গোলমরিচ চায়ে থেঁতো করে দেওয়া হয়েছে। জীবনে এই প্রথম ঝাল চা খেয়ে ধন্য হলাম! যাহোক, চা শেষ করে মন্দিরের পাশের হোটেলে ফিরে এলাম। অনেক বেলা হয়ে গেছে। পরটা আর চা খেয়ে, গেলাম শোণপ্রয়াগ যাওয়ার বাসের খবর নিতে। তীরথের কথা খুব মনে পড়ছে। আজ সকালে আমাদের ঘুম থেকে উঠতে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। ওর বাস খুব ভোরে বদ্রীনারায়ণ ছেড়ে চলে গেছে।

কেদারনাথ যেতে হলে, শোণপ্রয়াগ পর্যন্ত বাসে যাওয়া যাবে। খবর পেলাম বাস ছাড়ার ঘন্টাখানেক আগে টিকিট দেওয়া হয়। কেদারের রাস্তা খুব খারাপ হয়ে আছে। ওদিক থেকে কোন বাস আসছে না। ওদিক থেকে বাস এলে, তবে এদিকের বাসের টিকিট দেওয়া হবে। ঘরে ফিরে এসে দেখি একতলায় সিঁড়ির পাশে, বৃদ্ধ ভদ্রলোকের পাশের ঘরে, চার-পাঁচজন যুবক বসে আছে। পঞ্চভাই আর ওই বৃদ্ধ ভদ্রলোকও আছেন। বৃদ্ধ আমাদের কথা বোধহয় এদের আগেই বলেছেন। কারণ আমরা আসতেই তারা আমাদের ডেকে কথা বলতে শুরু করল। সবাই বাঙালি। দু'জনের বাড়ি আসানসোলে। ওদের মধ্যে দু'জন নাকি অমরনাথ ও কেদারনাথ হয়ে এখানে এসেছে। বাকীরা কেদারনাথেই প্রথম গেছিল। সেখান থেকে একটু আগে এখানে এসে পৌঁছেছে। একসঙ্গে অমরনাথ, ও কেদার-বদ্রী যেতে, আগে কারোর কথা শুনেছি বলে মনে করতে পারছি না। তবু মনটা বেশ পুলকিত হয়ে গেল। বাস তাহলে কেদারনাথ থেকে এসেছে। ওরা জানাল, মাঝ রাস্তায় ধ্বসের জন্য তাদের অনেকক্ষণ আটকে থাকতে হয়েছিল। গত দু'দিন কোন বাস আসে নি। কেদারনাথ থেকে আজই প্রথম বাস এসেছে তাদের নিয়ে। ওরা এখান থেকে নন্দন কানন, হেমকুণ্ড সাহেব যাবে। ওদের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়ে, আমরা কেদারের রাস্তার একটা মোটামুটি অবস্থা জেনে নিলাম।

প্রায় সন্ধ্যার সময় আবার বাস স্ট্যান্ডে গেলাম। সেই যুবকটিও তার কেদার যাবার জন্য শোনপ্রয়াগের দু'টো টিকিট কাটার টাকা দিয়ে দিল। কাউন্টারের ভদ্রলোক জানালেন, এই পথে প্রথমে যমুনোত্রী, তারপর গঙ্গোত্রী, তারপর কেদারনাথ হয়ে সব শেষে বদ্রীনারায়ণ যাওয়া সুবিধাজনক। তাই সকলে ঐ ভাবেই এই চার জায়গায় যায়। যারা শুধুমাত্র কেদার-বদ্রী যায়, তারাও প্রথমে কেদারনাথ গিয়ে, সেখান থেকে বদ্রীনারায়ণ আসে। কেদার থেকে বদ্রী আসার বাস অনেক আছে। আজ রাস্তা পরিস্কার হয়ে যাওয়ায়, ওদিক থেকে কিছু বাস এসেছে। আগামীকালও বেশ কিছু বাস আসবে। তবে এদিক থেকে সোজা শোনপ্রয়াগ যাওয়ার বেশি বাস নেই। কাল সকাল ন'টায় সোজা শোনপ্রয়াগ যাওয়ার একটাই বাস ছাড়বে, এবং সেটা সন্ধ্যাবেলা শোনপ্রয়াগ পৌঁছবে। কাল সারাদিনে ঐ একটাই ডিরেক্ট বাস, বা এখানকার ভাষায় "যাত্রাবাস" আছে। আর একভাবে আমরা যেতে পারি। সকাল ছ'টার বাসে রুদ্রপ্রয়াগ গিয়ে, ওখান থেকে শোনপ্রয়াগের বাস ধরতে পারি। পৌঁছতে পৌঁছতে সেই সন্ধ্যাই হয়ে যাবে। ভাবলাম দু'ভাবেই পৌঁছতে যদি সন্ধ্যা হয়ে যায়, তবে যাত্রাবাসেই যাওয়া ভাল। বাস বদল করবার ঝামেলা নেই, বসবার জায়গা না পাওয়ার ঝুঁকি নেই। সবশেষে জানা গেল, যাত্রাবাসের টিকিট এখন পাওয়া যাবে না - কাল সকাল আটটায়।

ফিরে এলাম। সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত্রি নামল। মাধব ও দিলীপ গেল মন্দিরে আরতি দেখতে। আমি সুটকেস গোছাতে বসলাম। বেশ কিছুক্ষণ পরে সঙ্গীরা ফিরে এসে আমার কাজে সাহায্য করতে শুরু করে দিল। সুটকেস ও কাঁধের একটা ব্যাগ গুছিয়ে রাখলাম। কাল সকালে হোল্ড-অল বেঁধে ফেললেই হবে। পঞ্চভাই একটা বদ্রীনারায়ণের মালা নিয়ে এল। আমাদের তিনজনের নামধাম ওর খাতায় টুকে নিল। নাম, বাবার নাম, গোত্র ইত্যাদি অতি প্রয়োজনীয় বিষয় জেনে নিয়ে, মন্ত্র পড়ে তিনজনকেই কপালে চন্দনের ফোঁটা পড়িয়ে দিল। হাতে খানিকটা করে পুজোর চরণামৃতও দিল। মাধব ও দিলীপ তাকে ভক্তিভরে প্রণাম করল। আরেকটু পরে হোটেলে গিয়ে রাতের খাবার খেয়ে এলাম। কিছুক্ষণ নিজেরা গল্পগুজব করে সময় কাটালাম। আজ একুশে আগষ্ট, বাড়ি থেকে দিন আষ্টেক হ'ল এসেছি। বাড়ির কথা খুব মনে পড়ছে। যে যার বাড়িতে চিঠি লিখে, শুয়ে পড়লাম।

(এরপর আগামী সংখ্যায়)

[আগের পর্ব - ফুলের দেশে কিছুক্ষণ]

বদ্রীনারায়ণ - এখন

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের অবসরপ্রাপ্ত অফিসার সুবীর কুমার রায়ের নেশা ভ্রমণ ও লেখালেখি। ১৯৭৯ সালে প্রথম ট্রেকিং – হেমকুন্ড, ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স, বদ্রীনারায়ণ, মানা, বসুধারা, ত্রিযুগী নারায়ণ, কেদারনাথ, গঙ্গোত্রী-গোমুখ ও যমুনোত্রী। সেখান থেকে ফিরে, প্রথম কাগজ কলম নিয়ে লিখতে বসা। ভ্রমণ কাহিনি ছাড়া গল্প, রম্য রচনা, স্মৃতিকথা নানা ধরণের লিখতে ভালো লাগলেও এই প্রথম কোন পত্রিকায় নিজের লেখা পাঠানো। 'আমাদের ছুটি' পত্রিকার নিয়মিত লেখক, পাঠক, সমালোচক এবার থেকে নেমে পড়েছেন কীবোর্ডে-মাউসে সহযোগিতাতেও।

কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

ধারাবাহিক ভ্রমণকাহিনি - হিমালয়ের ডায়েরি (তৃতীয় পর্ব)

আগের পর্ব - ফুলের দেশে কিছুক্ষণ

বদ্রীনারায়ণ থেকে মানা ও বসুধারা

সুবীর কুমার রায়

পূর্বপ্রকাশিতের পর -

পরটাগুলো গরম করে নিয়ে কফির সঙ্গে খেতে ভালই লাগল। মাধব গিয়ে কম্বলগুলো গুরুদ্বোয়ারা কর্তৃপক্ষকে ফেরৎ দিয়ে, আমাদের জিনিসগুলো নিয়ে এল। দোকানে বসেই ঘাংরিয়া গুরুদ্বোয়ারার একটা ছবি নিলাম। কয়েকজন মিলিটারি, দোকানের বাইরে দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছে। অনেকদিন বাড়ি ছেড়ে বেরিয়েছি। গোটা পৃথিবীর কোন খবর আমরা এতদিন পাইনি। ওদের হাতে রেডিও দেখে খবর জিজ্ঞাসা করলাম, ওরা জানাল, প্রধান মন্ত্রী চরণ সিং পদত্যাগ করেছেন। ওসব খবর তখন মোটেই মুখরোচক মনে হল না। দাম মিটিয়ে গোবিন্দঘাটের উদ্দেশ্যে হাঁটতে শুরু করলাম। নন্দন কানন থেকে ফিরবার পথে চারজন যুবকের সাথে দেখা হয়েছিল। তারা বোধহয় হেমকুণ্ড সাহেব পরে যাবে। তাদের একজনের হাতে দেখলাম, সাদা বেশ কয়েকটা কাগজ যত্ন করে পলিথিন পেপারে মোড়া। আলাপ হলে জিজ্ঞাসা করেছিলাম এই কাগজগুলো কী জন্য নিয়ে যাচ্ছে। উত্তরে একজন বলেছিল, এগুলো ব্লটিং পেপার, এটা দিয়ে মুড়ে ব্রহ্মকমল নিয়ে যাবে। তাতে নাকি ফুল অনেকদিন টাটকা থাকে। আমি হেসে বললাম, 'মৌয়া গাছের মিষ্টি ছায়া ব্লটিং দিয়ে শুষে, ধুয়ে মুছে সাবধানেতে রাখছি ঘরে পুষে', গোছের ব্যাপার বলছেন। সত্যিই কী ব্লটিং পেপারে মুড়ে রাখলে, ফুল অনেকদিন ভাল ও টাটকা থাকে? ওরা বলল তাই শুনেছে। বললাম, নন্দন কাননে কিন্তু ব্রহ্মকমল পাবেন না, ব্রহ্মকমল নিতে গেলে হেমকুণ্ড সাহেব যেতে হবে। ওরা তবু বললো না না, নন্দন কাননেই তো আসল ব্রহ্মকমল পাওয়া যায়। বললাম দু-দু'বার ঘুরে আসলাম, আসল নকল একটাও তো চোখে পড়ে নি। দেখুন চেষ্টা করে, বেষ্ট অফ লাক। এখন হঠাৎ ওদের কথা এসে পড়ায়, দিলীপ বলল, আগে জানলে ব্লটিং পেপার নিয়ে আসতাম। একে ব্রহ্মকমল খুব একটা বেশি নেওয়া হয় নি, তাও আবার যদি ভাল না থাকে, তবে দুঃখের শেষ থাকবে না।

সকালবেলা তীরথ চলে যাওয়ার আগে, আমাদের একটা পলিথিন ব্যাগে করে, ওদের বাড়িতে তৈরি ঘিয়ে ভাজা আটার মতো এক প্রকার খাবার দিয়ে গেছে। রাস্তায় খবর পেলাম বিকেল চারটের সময় শেষ বাস পাওয়া যাবে। হাতে সময় খুব অল্প। কোন দোকানে চা পর্যন্ত না খেয়ে, তীরথের দেওয়া নতুন খাবার মুখে পুরে, আমরা প্রায় ছুটে নেমে চলেছি। হেমকুণ্ড, নন্দন কানন থেকে ফিরছি বলে, পথে হেমকুণ্ডগামী পাঞ্জাবীরা আমাদের সাথে কথা বলছে, খোঁজখবর নিচ্ছে। অল্প কথায় আলাপ সেরে, আবার সামনে এগিয়ে চলেছি। জঙ্গলচটিতে এসে আমরা চা খেলাম, সঙ্গে তীরথের দেওয়া আটাভাজা। জিনিসটা নতুন হলেও, খেতে বেশ ভালই। এখানে আবার শুনলাম বদ্রীনারায়ণ যাবার বাস, পৌনে পাঁচটার সময় পাওয়া যাবে। বুকে নতুন আশা নিয়ে দাম মিটিয়ে ছুটলাম। একনাগাড়ে নীচের দিকে নামতে নামতে, পাগুলো বেশ ব্যথা করছে। যতদূর দৃষ্টি যায় দেখবার চেষ্টা করছি নীচের গুরুদ্বোয়ারা দেখতে পাওয়া যায় কী না। এখনও কিছু নজরে পড়ে নি। আরও কিছু পথ চলার পর, হঠাৎ দূরে, বহুদূরে, আমাদের আকাঙ্খিত গুরুদ্বোয়ারার দেখা মিলল। এবার আমাদের হাঁটার গতি আরও বেড়ে গেল। সবকিছু ঠিক থাকলে, আজই আমরা বদ্রীনারায়ণ পৌঁছচ্ছি। শেষ পর্যন্ত গুরুদ্বোয়ারার সামনে এসে হাজির হলাম। সামনে কয়েকজন পাঞ্জাবী বসে আছে। তীরথকে দেখলাম না। সময় নষ্ট না করে, দোতলায় মাল রাখার ঘরে গেলাম। বাইরে থেকে দরজায় তালা ঝুলছে। এদিকে প্রায় সাড়ে চারটে বাজে। দৌড়ে গেলাম কুলি ডাকতে। একজন কুলির কাছেই জানতে পারলাম, এক পাঞ্জাবীর কাছে মাল রাখার ঘরের চাবি থাকে, এবং সে বাস রাস্তায় গেছে। মাধবকে ডুপ্লিকেট চাবি কার কাছে থাকে জেনে মাল নেওয়ার ব্যবস্থা করতে বলে, ছুটলাম বাস রাস্তার দিকে। কুলিটা জানালো সেই পাঞ্জাবীটি মিলিটারি রঙের জামা ও পায়জামা পরে আছেন। মাধবকে বললাম, ভদ্রলোককে খুঁজে পাঠিয়ে দিচ্ছি আর রাস্তায় বাস থামাবার জন্য অপেক্ষা করছি। দেখি যদি অনুরোধ করে বাসটাকে পাঁচ-সাত মিনিট বেশি সময় দাঁড় করানো যায়। বাস রাস্তায় যাবার পথেই পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। হাতজোড় করে তাঁকে তাড়াতাড়ি ঘর খুলে মালপত্র বার করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলাম। এও জানালাম যে আমার দু'জন সঙ্গী গুরুদ্বোয়ারায় কুলি নিয়ে অপেক্ষা করছে। তিনি সম্মতি জানিয়ে জোর কদমে গুরুদ্বোয়ারার দিকে পা চালালেন। খানিক বিরক্তিও লাগছিল যে তীরথ আমাদের জন্য অনেক করছে ঠিকই, কিন্তু বাধ্যতামূলকভাবে এই গুরুদ্বোয়ারায় থাকাটা ভালোলাগছিলনা, অনেকটা ওদের মতো করেই চলতে হচ্ছিল। তীরথের দেখা না পেয়ে যেন একটু স্বস্তিই পেলাম, মনে হল বদ্রীনারায়ণ গিয়ে নিজেদের পছন্দ মতো যেকোন হোটেলে ওঠা যাবে। আর আমাদের গুরুদ্বোয়ারায় মালপত্র নিয়ে লাইন দিয়ে উদ্বাস্তুদের মতো রাত কাটাতে হবে না। এইসব ভাবতে ভাবতে বাস রাস্তায় এসে, সামনে তাকিয়ে চমকে উঠলাম। তীরথ দাঁড়িয়ে। ওর মা, বোন ও ভগ্নীপতি একটা চায়ের দোকানে বেঞ্চে বসে আছেন। তীরথ আমায় দেখেই প্রায় ছুটে এসে, নন্দন কানন সম্বন্ধে নানারকম প্রশ্ন করতে শুরু করে দিল। ওকে জুতো হারানোর গল্প বললাম। ওর মাকে নিজের ভাষায় ঘটনাটা বলল। নতুন নতুন ফুল কী কী দেখেছি, এবং কবরখানার কথা বলতে, ও এগুলো দেখতে না পাওয়ার জন্য আফসোস করে বলল, গতকাল আর একটু কষ্ট করে এগিয়ে গেলেই ভাল হত। ও আজ এখানেই থাকবে বলে স্থির করেছিল। কিন্তু ভগ্নীপতি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায়, আজই বদ্রীনারায়ণ যাচ্ছে। কাল ভোরে গরমকুণ্ডে স্নান সেরে দেশের উদ্দেশ্যে রওনা দেবে। ও চলে যাচ্ছে, এবং কেন চলে যাচ্ছে জানিয়ে, গুরুদ্বোয়ারায় একটা চিঠি লিখে রেখে এসেছে, আমাদের দেওয়ার জন্য।

ব্যাস গুহা

অনেকক্ষণ সময় কেটে গেল, মাধবদের পাত্তা নেই। তীরথকে বললাম, একটু এগিয়ে দেখি। ও বলল, চিন্তা কোরো না, ওরা ঠিক সময়ে চলে আসবে। একটু পরেই অনেক দূরে মাধব, দিলীপ ও কুলিকে লাইন দিয়ে আসতে দেখা গেল। সবার জন্য চায়ের অর্ডার দিয়ে, এগিয়ে গিয়ে মাল নিলাম। হাল্কা বৃষ্টি শুরু হওয়ায়, দাঁড়িয়ে থাকা একটা গাড়ির তলায় মালপত্রগুলো ঢুকিয়ে রাখলাম। চা দিয়ে গেল। একটাও চুমুক দেবার আগেই বাস এসে গেল। চা ফেলে রেখে বাসের ছাদে উঠে মালপত্র সাজিয়ে রাখলাম। কুলির পয়সা দিতে গিয়ে দেখা গেল খুচরো নেই। তীরথের বোনের কাছ থেকে দুটো টাকা নিয়ে, কুলিকে বিদায় করলাম। আমি ও মাধব বাসের ছাদে মাল তোলায় ব্যস্ত ছিলাম। মালপত্র তুলে রেখে এসে দেখি, তীরথের মা আমাদের জন্য কাপড় পেতে বসার জায়গা সংরক্ষণ করে রেখেছেন। আমরা সবাই বাসে বসার জায়গা পেলাম। বদ্রীনারায়ণ পর্যন্ত বাস ভাড়া মাত্র দু টাকা পঁচাত্তর পয়সা। তীরথ আমাদের বাস ভাড়াও দিতে গেল। আমরা কিছুতেই রাজী না হওয়ায় বলল, ঠিক আছে, তাহলে তোমরা তোমাদের ভাড়া দাও, আমি আমাদের চারজনের ভাড়া দিচ্ছি।

বাস ছেড়ে দিল। আগামীকাল সকালের পর আর আমাদের কোন দিন দেখা হবেনা বলে, তীরথের মা খুব দুঃখ প্রকাশ করলেন। বললাম মন খারাপ করবেন না। পৃথিবীটা গোল, একদিন না একদিন আবার দেখা হবেই। তাছাড়া কোনদিন পাঞ্জাবে যাওয়ার সুযোগ আসলে আপনাদের ওখানে তো যাবই। খুব খুশী হয়ে বললেন, তোমাদের যতদিন ইচ্ছে, আমার ওখানে প্রেমসে থাকতে পার। তীরথ এবার বললো, রায় তুমি তো গান জান। সামনেই আমার বিয়ে। তুমি তোমার বন্ধুদের নিয়ে আসবে, হারমোনিয়াম বাজাবে। নতুনদার সাথে কোথায় যেন নিজের মিল খুঁজে পেলাম। একটু থেমে, তীরথ হঠাৎ বলল, যদি কিছু মনে না করো তো একটা কথা বলতাম। তোমরা তিনজনে যাবে অনেক জায়গা। হেলং এর মতো পথে আরও বিপদ আসতে পারে। আমার কাছে যথেষ্ট টাকা আছে, প্রয়োজন হলে কিছু রেখে দাও। পরে কোন কারণে প্রয়োজন হলে আর আমার সঙ্গে দেখা হবে না, বিপদে পড়বে। ওর মাও বললেন তীরথের থেকে কিছু টাকা নিয়ে রেখে দাও বেটা। তাঁকে বললাম, কথাটা শুনে খুব ভাল লাগল। আমাদের টাকার আর প্রয়োজন হবে না, ধন্যবাদ। তবু তীরথ আবার বলল, নাহয় ধার হিসাবেই রাখ, বাড়ি ফিরে গিয়ে ফেরত দিয়ে দিও। ওকে জানালাম, আমরা প্রয়োজনের বেশিই টাকা নিয়ে এসেছি, দরকার হবে না। এবার তীরথের বোনকে কুলিকে দেওয়া টাকা দুটো ফেরত দিতে গেলে, ও কিছুতেই নেবে না। বলল, মাত্র দুটো টাকা, তাও ফেরত দেবে? ভাইয়ার কাছ থেকে ও টাকা আমি ফেরত নিতে পারব না। কী বিপদ, এরা আমাদের ভেবেছেটো কী? বললাম টাকা ভাঙানো ছিলনা বলে নিয়েছিলাম, ফেরত না নিলে খুব দুঃখ পাব। ও আর কথা না বাড়িয়ে টাকাটা নিয়ে নিল।

তীরথ বলল আজ রাতটা ওরা বদ্রীনারায়ণে কোন একটা ভাল হোটেলে উঠবে, আমরা যেন একই হোটেলে উঠি। কিছু না বলে চুপ করে বসে, সামনের দিকে উদাসভাবে তাকিয়ে রইলাম। সন্ধ্যাবেলা বাস এসে বদ্রীনারায়ণ পৌঁছলো। কুলিরা ছুটে এল। একজন পাণ্ডা পরিস্কার বাংলায় আমাদের বলল তার ওখানে উঠতে। মন্দিরের পাশেই সে থাকে। জিজ্ঞাসা করলাম, মন্দিরটা কোথায়? হাত তুলে দূরে দেখাল। ঘন কুয়াশায় কিছুই দেখা গেল না। পাণ্ডা বলল, আপনারা বাঙালি বলেই বলছি। কথা শুনে বুঝতে পারছি, বাংলা বললেও বাঙালি নয়। ব্যবসার খাতিরে বাংলাটা শিখেছে। কত টাকা দিতে হবে জিজ্ঞাসা করায় বলল, আমাদের যা ইচ্ছা দিলেই হবে। নাম জিজ্ঞাসা করায় সে জানাল, 'পঞ্চভাই' বললে এখানে যে কেউ তাকে দেখিয়ে দেবে। জানিনা পাঁচ ভাই মিলে পার্টনারশিপ ব্যবসা ফেঁদেছে কী না। এবার তীরথকে বললাম যে ওরা তো সকালেই চলে যাবে, কিন্তু আমরা এখানে তিন-চার দিন থাকব। দামী হোটেলে তিন-চার দিন থাকা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। কাজেই আজ আমরা এই ভদ্রলোকের বাড়িতেই উঠি। পছন্দ না হলে কাল অন্য কোথাও ঠিক করে নেওয়া যাবে। তারা যেন কিছু মনে না করে। কাল প্রথম বাসে তাদের হৃষিকেশ যাওয়ার সময় আমরা এসে, তাদের বিদায় জানিয়ে যাব। তীরথ কুলির হাতে মালপত্র দিয়ে, মা, বোন আর ভগ্নীপতিকে নিয়ে এগিয়ে গেল।

বদ্রীনারায়ণ - তখন

পঞ্চভাই-এর সঙ্গে একটা বাচ্চাছেলে এসেছিল। সম্ভবত ওর অ্যাসিস্ট্যান্ট। কুলির হাতে মালপত্র দিয়ে, তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমরাও এগোলাম। মাধবের লাঠির নালটা আলগা হয়ে গিয়েছিল। কুলিটা লাঠিগুলোর ওপর ভর দিয়ে হাঁটছিল। মাধবকে বললাম লাঠিগুলো ওর হাত থেকে নিয়ে নিতে। ও বলল, থাক কিছু হবে না। মন্দিরে এসে পৌঁছলাম। ও বাবা, এ তো রীতিমতো শহর। মন্দিরের সঙ্গেই ডানপাশে বিরাট একটা হোটেল। দুটোর মাঝখান দিয়ে সিঁড়ি ভেঙ্গে আমাদের যেতে হবে। পাশের একটা দরজা দিয়েও মন্দিরে ঢোকা যায়। একটু ওপরেই পঞ্চভাই-এর আস্তানা। একটা ঘেরা বারান্দা, শতরঞ্চি পাতা আছে। একজন মোটাসোটা যুবক ও একজন বৃদ্ধ তাতে বসে গল্প করছে। তাদের পাশ দিয়ে পরপর দুটো ঘরের দ্বিতীয়টায় গিয়ে ঢুকলাম। ছোট ঘর, দুটো দরজা একটা জানালা। একটা দরজা দিয়ে বারান্দায় বেরোতে হয়। অপরটা পাশের ঘরে যাওয়ার। এই দরজাটা বন্ধ। বুঝলাম বাইরে বসে থাকা দুজন ঘরটা নিয়েছেন। পাশের ঘর থেকে ঘন ঘন কাশির আওয়াজ আসছে। তার মানে ওরা সংখ্যায় তিনজন। আমাদের ঘরটা ভালই। যারা বাইরে যাওয়া বলতে শুধুই বিলাসবহুল হোটেলের ঘর বোঝেন, তাদের কথা বলতে পারব না। কিন্তু আমাদের মতো যারা এপথে শুধু দেখতেই এসেছে, এবং ঘর বলতে রাতের নিশ্চিন্ত আশ্রয় বোঝে, তাদের জন্য ঠিক আছে, অন্তত আমাদের চলে যাবে। যাহোক, পঞ্চভাই লেপ এনে দিল। আমাদের মালপত্র তাকে গুছিয়ে রাখলাম। বারান্দায় আসতেই ওরা জিজ্ঞাসা করল আমরা কোথা থেকে আসছি। আমরা আজকের সমস্ত ঘটনা বলে বললাম, আজ বদ্রীনারায়ণের বাস ধরবার জন্য প্রায় ছুটে ছুটে আসার জন্যই বোধহয় পায়ে বেশ ব্যথা হয়েছে। পায়ে ব্যথার কথা শুনেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক বললেন, তাহলে আর এখানে বসা যাবে না। কেন বসা যাবে না জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বললেন ইয়ং ছেলে, এইটুকু পথ হেঁটেই পায়ে ব্যথা হয়ে গেল? যুবকটির থেকে জানলাম, বৃদ্ধ তার কেউ হয় না। একতলায় একটা ঘর নিয়ে থাকেন। ন'বছর বাড়ি ছাড়া হয়ে, হিমালয় দর্শন করে বেড়াচ্ছেন। বৃদ্ধকে বললাম, এপথে আসার জন্য শারীরিক শক্তি কোন কাজে লাগে না। মনোবলই সব। বাড়ি কোথায় জিজ্ঞাসা করাতে, তিনি বলতে চাইলেন না। পরে জেনেছিলাম তাঁর বাড়ি নদীয়া জেলায়। ভদ্রলোকের পায়ের পাতায় বিরাট বিরাট ঘা, লাল রঙের ওষুধ লাগানো আছে। শুনলাম জোঁকের আক্রমণে এই অবস্থা হয়েছে। দুমাস হাসপাতালেও ছিলেন। একটু পরেই ভদ্রলোক একতলায় চলে গেলেন। যুবকটি বলল, তার বাড়ি বর্দ্ধমানের মেমারীতে। সোনার দোকান আছে। তারা কেদারনাথ যাওয়ার উদ্দেশে রওনা দিয়ে রাস্তার ধ্বসের জন্য বাস যেতে না পারায়, বদ্রীনারায়ণ চলে এসেছে। আমরা এখান থেকে কেদারনাথ যাব শুনে, সেও একসঙ্গে যেতে চাইল। তার এক কর্মচারী আছে, তাকে খচ্চর ভাড়া করে দেবে।

একবার বাইরে যাওয়ার জন্য নীচে নেমে দেখি, একতলার বৃদ্ধটি ওই ঠাণ্ডায় বাসন ধুচ্ছেন। তিনি আমাদের এখানে কী কী দেখবার আছে জানালেন। মন্দিরে এলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই চন্দন চর্চিত বদ্রীবিশালকে সম্পূর্ণ নগ্ন করে, নতুন বস্ত্র পরানো হ'ল। তাঁর গলার পুরাতন মালার চাহিদা দেখলাম খুব। উপস্থিত সমস্ত ভক্তই হাত বাড়িয়ে মালা বা ফুলের টুকরো নিতে চাইছে। মূর্তির মাথার মুকুটটা দূর থেকে দেখলেও চোখ ঝলসে যাবে। শুনলাম ওটার মূল্য নাকি এক কোটি টাকা। হতেই পারে, মন্ত্রীদের যেখানে কোটি টাকার সম্পত্তি থাকে, নারায়ণের থাকতে আপত্তি কোথায়?

তপ্তকুণ্ড - বদ্রীনাথ

কালো পোশাক পরা এক পুরোহিত পুজোর সব কাজ করছেন। সামান্য আরতির মত হল। শুনলাম এবার মন্দিরের দরজা বন্ধ করা হবে। আমাদের সঙ্গে পঞ্চভাই পাণ্ডাও মন্দিরে গিয়েছিল। তার চেষ্টায় সবার আগে দাঁড়াবার সুযোগও পেয়েছিলাম। কয়েকজন লোক মূর্তির অনতিদূরে - আমাদের আর মূর্তির মাঝখানে বসে। তারা নাকি ভি.আই.পি. মানুষ। একজন লম্বা চওড়া লোক মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করল - সঙ্গে বডিগার্ড। শুনলাম ইনি একজন ভি.ভি.আই.পি.। মন্দিরে এই আলাদা ব্যবস্থা দেখব আশা করি নি। পাঞ্জাবীদের কোন গুরুদ্বোয়ারায় এ রকম দেখি নি। অথচ দেশে শিখ ধর্মাবলম্বী ভি.ভি.আই.পি-র অভাব আছে বলে তো মনে হয় না। জয় বদ্রীবিশাল কী জয়। মন্দিরের বাইরে বেরিয়ে এলাম।

ঘরে ফিরে ঠিক করলাম আগামীকাল সকালে ভারতের শেষ গ্রাম, 'মানা'র ওপর দিয়ে 'বসুধারা' যাব। একতলার সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক বললেন, বেশ কয়েক কিলোমিটার দূরে শতপন্থ লেক। খুব সুন্দর জায়গা, তবে ওখানে যেতে গেলে চামোলী থেকে অগ্রিম অনুমতি পত্র নিয়ে আসতে হয়। জানা ছিলনা, তাই আর যাওয়ার চেষ্টা করে লাভ নেই। একটু পরে মন্দিরের পাশের দোকানে রুটি, তরকারি খেতে গেলাম। দেখা হল ঘাংঘারিয়ার সেই বাঙালি ভদ্রলোকের সঙ্গে, যিনি আমাদের ভাঙ্গা গ্লেসিয়ার আর নদীর কথা বলেছিলেন। তাঁর সঙ্গে হেমকুণ্ডে সাঁতার কাটতে দেখা সেই জাপানি ছেলেটিও রয়েছে। দুজনেরই কোন সঙ্গী না থাকায় একসাথেই রয়েছেন শুনলাম। বাঙালি ভদ্রলোকটির বাড়ি মধ্যপ্রদেশে, ভারত হেভি ইলেকট্রিক লিমিটেড-এ কাজ করেন। আমরা নন্দন কাননের ভাঙ্গা গ্লেসিয়ারটা পার হয়ে গেছিলাম কী না জিজ্ঞাসা করায়, তাঁকে আমাদের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা বললাম। এঁর উল্টো দিকের চেয়ারে আর এক ভদ্রলোক বসেছিলেন। তাঁকে দেখতে অনেকটা বাঙালিদের মতোই। উনি ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করলেন, আমরা কী বলছি। বুঝলাম ইনি বাঙালি নন। আমাদের পরিচিত ভদ্রলোক তাঁকে সমস্ত ঘটনা বলাতে, তিনি বললেন, খুব রিস্ক নিয়েছিলেন। দেশের জন্য, দশের জন্য লোকে প্রাণ দেয়, আপনি তো একটা জুতোর জন্য প্রাণ দিতেন!

একুশে আগষ্ট। সকালে ঘুম থেকে উঠে গেলাম তপ্তকুণ্ডে স্নান করতে। তিনজনে মাঝখানের চৌবাচ্চাটার জলে নামলাম। ডানপাশে মন্দিরের দিকে মুখ করে বসলে, জলের মধ্যে এক কোণে একটা সিমেন্ট বা পাথরের স্ল্যাব আছে। ওটায় সুন্দর বসে থাকা যায়। মাধব আর দিলীপ একটু পরেই মন্দিরে পুজো দিতে গেল। আমি গরম জলে বসে গায়ের ব্যথা কমাতে লাগলাম। সেই বাঙালি ভদ্রলোক ও জাপানি ছেলেটি এসে হাজির হল। বাঙালি ভদ্রলোক গরম জলে নামলেন। আর কিছুক্ষণ কাটিয়ে, জল থেকে উঠে জাপানি ছেলেটিকে প্রশ্ন করলাম, কেন জলে নামছে না? ইংরেজিতে কথা বললেও, 'থাওল থাওল' বলে সে কী যে বলতে চাইছে, বুঝতে পারছি না। হঠাৎ বুঝলাম ওর সঙ্গে টাওয়েল নেই। বললাম, ওর সঙ্গীর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে স্নান করতে, শরীর একবারে সুস্থ হয়ে যাবে। কাঁধের ঝোলা ব্যাগ থেকে তাকে একটু আমসত্ত্ব দিলাম। চোখ বুজে খাওয়া দেখে বুঝলাম, বস্তুটির সঙ্গে তার আগে পরিচয় না থাকলেও, আমসত্ত্ব তাকে যথেষ্ট তৃপ্ত করেছে। বেশ কিছুক্ষণ পরে ঘরে ফিরে দেখি, আমার সঙ্গী দুজন তখনও ফেরেনি। কিছুক্ষণ পরে তারা প্যাকেটে করে প্রসাদ নিয়ে ফিরে এল। আমরা মন্দিরের পাশে হোটেলে গেলাম। ওরই বাঁপাশ দিয়ে বসুধারা যাবার রাস্তা। এখানে দেখি ধোসাও পাওয়া যায়। গরম গরম ধোসা আর চা খেয়ে আমরা রওনা দিলাম। আগের দিনের সেই যুবকটিও আমাদের সঙ্গী হল।

এখান থেকে তিন কিলোমিটার দূরে ভারতের শেষ গ্রাম 'মানা'। মন্দিরের বাঁপাশে, অর্থাৎ হোটেলটার কাছে একটা নোটিশ বোর্ডে লেখা আছে - বিদেশিদের ওই নোটিশ বোর্ডের ওপারে যাওয়া নিষেধ। জানলাম চামোলী থেকে অনুমতি পত্র আনলে বিদেশিদের বসুধারা যেতে দেওয়া হয়। জাপানি ছেলেটির আর বসুধারা দেখা হল না। যাওয়ার পথে অনেকে বলল, ক্যামেরা নিয়ে বসুধারা যেতে দেওয়া হয়, আবার অনেকেই বলল, যেতে দেওয়া হয় না। আমাদের সঙ্গে অতি সাধারণ একটা ভারতীয় ক্যামেরা। সেটা গলায় ঝুলিয়ে নিয়ে চললাম। ডানপাশে মিলিটারি আড্ডা, প্রচুর ঘোড়া ও ট্রাক দাঁড়িয়ে। একটা ব্রিজ পার হয়ে ওখানে যেতে হয়। একসময় আমরা মানা গ্রামে এসে হাজির হলাম। কেউ কিন্তু ক্যামেরা চাইল না। অনেকগুলো বাচ্চা পিছন পিছন পয়সার জন্য আসছে। শুনলাম এখান থেকে উনচল্লিশ কিলোমিটার দূরে তিব্বত বর্ডার।

বসুধারা ও মানার পথে

একটু এগোতেই ছোট একটা মিলিটারি ক্যাম্প। আমাদের থেকে যুবকটি একটু এগিয়ে গিয়েছিল, ও দেখলাম দাঁড়িয়ে আছে। কাছে যেতে আমার গলায় ঝোলানো ক্যামেরাটা মিলিটারিরা চেয়ে নিল। ওরটা আগেই নিয়েছে। আরও বেশ খানিকটা পথ হেঁটে আমরা ভীমপুল এসে পৌঁছলাম। সরু নদী, কিন্তু ভীষণ তার গতি। অসম্ভব রকম গর্জন করে বয়ে যাচ্ছে। নদীর দুপারের দুটো বড় পাথরের উপর একটা বিশাল পাথর যেন শুইয়ে রাখা হয়েছে। একটা দশ-বার ফুটের ব্রিজ বা পুল। ব্রিজের বেশ খানিকটা নীচ দিয়ে সেই ভয়ঙ্কর নদী বয়ে যাচ্ছে। নীচে নদীর দিকে তাকালে মাথা ঘুরে যায়। আসবার পথে শুনেছি এটা নাকি সরস্বতী নদী। মহাপ্রস্থানের পথে যাবার সময় ভীম এই বিশাল পাথরটা ফেলে, এই পুল তৈরি করেন। যাহোক, ওখানে বসে ভাবছি সরস্বতী নদী কী সারা দেশের ওপর দিয়েই বয়ে গেছে? তাহলে সর্বত্র তার স্বাস্থ্য এত খারাপ কেন? এই ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে কী ভাবেই বা সে এতটা পথ পাড়ি দেয়? এখানে এই ভয়ঙ্কর নদীর ওপর কী অদ্ভুত একটা ব্রিজ! কত কম খরচে নদীর ওপর ব্রিজ তৈরি করা যায়, এখনকার বড় বড় ইঞ্জিনিয়ারদের ভীমের কাছ থেকে শেখা উচিত। কোনরকম রক্ষণাবেক্ষণ খরচ ছাড়াই, যুগের পর যুগ দিব্যি ব্যবহারযোগ্য হয়ে টিঁকে আছে।

সরস্বতী নদী

এমন সময় সেই বাঙালি ভদ্রলোক গলায় এক দামী বিদেশি ক্যামেরা ঝুলিয়ে এসে হাজির হলেন। আমরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি কী ভাবে ক্যামেরা নিয়ে এখানে এসেছেন। তিনি তো আমাদের কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। বললেন, এই ভাবেই গলায় ক্যামেরা ঝুলিয়ে সোজা এখানে এসেছেন। পথে এক মিলিটারি তাঁর সঙ্গে আলাপও করেছে। কিন্তু কেউ তাঁকে ক্যামেরা রেখে যেতে বলেনি। দিলীপকে বললাম, তার মানে ক্যামেরা নিয়ে এখানে আসতে না দেওয়ার কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। আমরা দু'জনে আমাদের ক্যামেরা ফেরৎ আনতে আগের ক্যাম্পটার উদ্দেশ্যে ফিরে গেলাম। মাধব, আমাদের সঙ্গী যুবকটি ও বাঙালি ভদ্রলোক ভীমপুলে বসে থাকলেন। ক্যাম্পে এসে ওখানকার মিলিটারি প্রধানকে বললাম, "আমরা সাধারণ ভারতীয়, আমাদের সঙ্গের ক্যামেরাটাও অতি সাধারণ ভারতীয় ক্যামেরা। বহুদূর থেকে এখানে এসেছি। যদি অনুমতি দেন তাহলে ভীমপুল বা বসুধারার ছবি নিয়ে গিয়ে, বাড়ির লোকদের দেখাতে পারি"। ভদ্রলোক খুব শান্ত ও ভদ্রভাবে বললেন, বসুধারার ছবি তোলা গভর্ণমেন্টের কড়া বারণ। তাঁর কিছু করার নেই। আমরা জানালাম এক ভদ্রলোক ক্যামেরা নিয়ে ভীমপুলে অপেক্ষা করছেন, তাকে কেন নিয়ে যেতে দেওয়া হ'ল? মিলিটারি ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে তাঁর সঙ্গীদের ডাকলেন। ক্যাম্পের ভিতর থেকে দু'জন সঙ্গী বেরিয়ে এসে সব শুনেই, ঘোড়া নিয়ে ঐ বাঙালি ভদ্রলোককে ধরতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হ'ল। ভাবলাম কেন বলতে গেলাম। কিন্তু কথাটা বলে ভদ্রলোকের বোধহয় মঙ্গলই করেছি। নাহলে ফিরবার সময় তাঁর বিপদ হ'তই। আমি খুব শান্ত ভাবে নরম গলায় মিলিটারিদের বললাম, আমি গলায় ক্যামেরা ঝুলিয়ে বসুধারা যাচ্ছিলাম। আপনারা ক্যামেরাটা এখানে জমা রেখে যেতে বলেছেন, আমি জমা দিয়ে দিয়েছি। আমার মতো ওই ভদ্রলোকও তাঁর ক্যামেরা গলায় ঝুলিয়ে নিয়েই এখান দিয়ে গেছেন। ক্যামেরা নিয়ে যাওয়া নিষেধ বলে কোন নোটিশ বোর্ড কোথাও নেই, আপনারাও তাঁর কাছ থেকে ক্যামেরা চেয়ে নেননি। ফলে তিনি না জেনে ক্যমেরা নিয়ে গেছেন। আমার কাছে না চাইলে, আমিও তো ক্যামেরা নিয়েই চলে যেতাম। প্রথম যে মিলিটারি অফিসারের সঙ্গে আমরা কথা বলছিলাম, তিনি এবার বেশ কড়া সুরে বললেন "অসম্ভব, এদিক দিয়ে গেলে আমরা ক্যামেরা চেয়ে নিয়ে জমা রাখবই। ওপাশ দিয়ে আর একটা রাস্তা আছে, সে দিকেও একটা ক্যাম্প আছে। ওদিক দিয়ে গেলে, ওই ক্যাম্পের কর্মীরা ক্যামেরা জমা নিয়ে নেবে। ক্যামেরা ইচ্ছা করলে আপনারা নিয়ে যেতে পারেন, তবে রীলে কত নম্বর পর্যন্ত ছবি তোলা হয়েছে নোট করে রাখা হবে। ফিরবার পথে দেখে নেওয়া হবে নতুন করে আর কোন ছবি তোলা হয়েছে কীনা। যদি কেউ ভুলবশতঃ না জানিয়ে ক্যামেরা নিয়ে চলেও যায়, তার ক্যামেরা থেকে রীলটা খুলে নেওয়া হবে"। বললাম - আপনাদের যাওয়ার দরকার নেই। কোন সভ্য ভারতীয় ভারত সরকারের নিষেধ অমান্য করে না। ভদ্রলোককে আমি আপনাদের কথা বলে ছবি তুলতে বারণ করে দেব। আমার কথা শুনে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ওই ভদ্রলোক আমাদের লোক কী না, বা আমাদের সঙ্গে এসেছেন কী না। বললাম তিনি আমাদের লোক নন, আমাদের সঙ্গে আসেনওনি। তবে তিনি বাঙালি, আমাদের ভাষা বোঝেন। আমি বারণ করলে তিনি কখনই ওখানকার ছবি তুলবেন না। অফিসারটি এবার অনেকটা নরম হয়ে বললেন, ঠিক আছে, আমি যেন তাঁকে ওখানকার কোন ছবি তুলতে বারণ করি। চলে আসছিলাম, হঠাৎ মনে হ'ল ব্যাপারটা আরও একটু পরিস্কার করে নেওয়া প্রয়োজন। ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করলাম, ভদ্রলোক আমার কথায় কোন ছবি তুলবেন না কথা দিতে পারি। কিন্তু ফেরার পথে তাঁরা বিশ্বাস করবেন তো? পরে কোন ঝামেলা হবে না তো? অবিশ্বাসের প্রশ্ন থাকলে তাঁরা গিয়ে ভদ্রলোকের ক্যামেরা নিয়ে আসতে পারেন। অফিসারটি বললেন ঠিক আছে তাঁকে যেন ছবি তুলতে বারণ করে দেওয়া হয়। পরে কোনরকম ঝামেলা করা হবে না।

নীলকন্ঠ শিখর

ফিরে এসে দেখি মাধব ও যুবকটি আমাদের জন্য অপেক্ষা করে বসে আছে। কিন্তু ক্যামেরার মালিক অনেকক্ষণ আগেই ক্যামেরা নিয়ে বসুধারার উদ্দেশে যাত্রা করেছেন। মহা চিন্তায় পড়লাম। মাধবকে সব বললাম। মাধব জানাল, একটু আগে তিনি তাকে সামনে দাঁড় করিয়ে ভীমপুলের একটা ছবি তুলেছেন। কী করা উচিত ভেবে না পেয়ে, এগিয়ে চললাম। বেশ কিছুক্ষণ পরে, বহুদূরে নীল জ্যাকেট পরা ভদ্রলোককে দেখতে পেলাম। একবারে ফাঁকা রাস্তা। মাঝে মাঝে মানা গ্রামের লোকেরা যাতায়াত করছে। দূরে বরফাচ্ছাদিত একটা শৃঙ্গ চোখে পড়ছে। হাত নেড়ে চিৎকার করে ভদ্রলোককে দাঁড়াতে বললেও, তিনি শুনতে পেলেন না। ভাবলাম রাস্তায় ছবি তুললে স্থানীয় লোকেরা যদি লক্ষ্য করে, তবে তারা হয়ত মিলিটারি ক্যাম্পে খবর দেবে। তখন আমিও না এর মধ্যে জড়িয়ে পড়ি। যাহোক ভদ্রলোক বোধহয় হাঁপিয়ে গিয়ে একটা জায়গায় বসে পড়লেন। আমরা জোর পায়ে আরও এগিয়ে গিয়ে, চিৎকার করে তাঁকে অপেক্ষা করতে বললাম। শেষে কাছে গিয়ে সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম। ভদ্রলোক সব শুনে খুব ভয় পেয়ে গিয়ে বললেন, ইতিমধ্যে তাঁর দুটো ছবি তোলা হয়ে গেছে। একটা ভীমপুলে, আর একটা মাঝপথে। আর মাত্র একটা ছবি তুললেই এই ফিল্মটা শেষ হয়ে যাবে। তাঁকে আর কোন ছবি তুলতে বারণ করে বললাম, ফিরবার পথে ওরা জিজ্ঞাসা করলে সত্যি কথা বলতে। কোন কারণে অবিশ্বাস করে ফিল্ম খুলে ওয়াশ করলে তিনি খুব বিপদে পড়বেন। ভদ্রলোক বললেন, তার ওয়াশিং চার্জ দেওয়াই আছে। সেরকম হলে তিনি অনুরোধ করবেন ফিল্ম খুলে নিয়ে ওয়াশ করে আপত্তিকর ছবি রেখে দিয়ে, বাকী ফটো অন্তত নষ্ট না করে তাঁকে পাঠিয়ে দিতে। শেষ পর্যন্ত তাই ঠিক হল।

আবার এগিয়ে চললাম। বহুদূরে বসুধারা ফলস দেখা যাচ্ছে। কিন্তু যতই হাঁটছি, দূরত্ব একই থাকছে বলে মনে হচ্ছে। রাস্তা খুব একটা কষ্টকর না হলেও, হাঁটতে আর ভাল লাগছে না। মানা গ্রামে একটা বোর্ডে লেখা ছিল – বসুধারা পাঁচ কিলোমিটার। অর্থাৎ বদ্রীনারায়ণ থেকে বসুধারা আট কিলোমিটার পথ। কিন্তু রাস্তা যেন আর শেষ হতেই চায় না। অবশেষে বসুধারা প্রপাতের তলায় এসে হাজির হলাম। পাহাড়ের চুড়ায় ভেন্টিলেটারের মতো একটা গর্ত থেকে মিল্ক পাউডারের মতো সাদা জল পড়ছে। কোনকালে হয়তো পাহাড় বেয়েই জলের ধারা নামতো। মনে হয় পাহাড়ের ক্ষয়ের ফলেই এখন পাহাড়ের গা বেয়ে না পড়ে, ওপর থেকে সোজা তলায় জল পড়ছে। ওপর থেকে সরাসরি জল যেখানে পড়ছে, আর আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, সেখান পর্যন্ত সাদা গ্লেসিয়ার। পাশ দিয়ে গ্লেসিয়ারের ওপর গেলে, ফলস-এর ঠিক তলায় যাওয়া যায়। শুনেছি বসুধারার তলায় দাঁড়ালে গায়ে যদি জল না লাগে, তাহলে বুঝতে হবে সে পাপী। ঝরনার ঠিক নীচে দাঁড়ালে একটুও জল গায়ে না লেগে কী ভাবে নিচে পড়তে পারে ভেবে পেলাম না। মনে হ'ল তবে কী সারা দুনিয়ার মানুষই কোন পাপ কাজ করে নি? পাপের জন্য আদালতে বিচার-সাক্ষীর প্রহসনে অযথা সময় ও অর্থ নষ্ট না করে, এখানে জলের তলায় দাঁড় করিয়ে দিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। সে যাই হোক, গ্লেসিয়ার বেয়ে লাঠি নিয়ে খানিকটা উঠলাম। মাধবের লাঠি আগের দিন কুলির ধকল সইতে না পেরে, নালছাড়া হয়েছে। বুঝলাম লাঠি নিয়ে চেষ্টা করলে ওঠা যাবে, কিন্তু নেমে আসা খুব কঠিন হবে। পা হড়কে রাস্তার ওপর, যেখানে সবাই দাঁড়িয়ে আছে, সেখান দিয়ে গড়িয়ে নীচের চাষের জমিতে চলে যেতে হবে। আস্তে আস্তে সাবধানে নীচে নেমে এলাম। সঙ্গে আমসত্ত্ব আছে, সকলে মিলে খানিকটা খেলাম। ভাবলাম জাপানি ছেলেটাকে আর একটু খাওয়ালে হয়। একটু পরে আমরা ফিরবার পথ ধরলাম।

রাস্তায় কোন জলের ব্যবস্থা নেই। কাজেই ওই ঝরনার জলই একটু খেয়ে, এগিয়ে চললাম। মাধব, দিলীপ ও যুবকটি আস্তে আস্তে অনেক পিছিয়ে পড়ল। আমি ও ক্যামেরা কেলেঙ্কারির নায়ক, গল্প করতে করতে এগিয়ে চলেছি। একসময় যুবকটিও এগিয়ে এসে আমাদের দলে যোগ দিল। মাধব ও দিলীপ এত পিছনে পড়ে গেল, যে ওদের আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। মাধবের হাঁটুতে একটা ব্যথা হয়েছে। চিন্তা হ'ল কোন অসুবিধায় পড়ল কী না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর, ওদের আবার বহুদূরে দেখতে পেলাম। একসময় আমরা সেই মিলিটারি ক্যাম্পের কাছাকাছি চলে এলাম। কোনরকম ঝামেলা হলে আমিও মুশকিলে পড়তে পারি ভেবে কায়দা করে ওদের থেকে পিছিয়ে গেলাম। আমরা তিনজন যখন ক্যাম্পে এসে পৌঁছলাম, দেখলাম যুবকটি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। বাঙালি ভদ্রলোক তাঁর ক্যামেরা সমেত ভালভাবে ফিরে গেছেন। বুঝলাম কোন ঝামেলা হয় নি, মিলিটারিরা তাদের কথা রেখেছে। ক্যামেরা ফেরত নিলাম। পাশেই কয়েকজন বৃদ্ধা ভেড়ার লোম দিয়ে কম্বল বা ওই জাতীয় কিছু তৈরি করছেন। কয়েকটা বাচ্চা তাঁদের ঘিরে খেলা করছে। একজন বৃদ্ধা একটা বালতি নিয়ে এসে আমায় কী বললেন, বুঝতে পারলাম না। আবার জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বললেন, আমার ওয়াটার বটলটার কত দাম? আমাদের দেশে এগুলো সস্তা কী না? বললাম এটার দাম সাত টাকা। তিনি বললেন যে তিনি আমাকে সাতটা টাকা দিচ্ছেন, আমি যেন তাঁকে এটা দিয়ে দিই। আমি ইচ্ছা করলে তাঁর বালতিটা নিয়েও এটা তাঁকে দিতে পারি। এরকম যে কোন প্রস্তাব আসতে পারে, স্বপ্নেও ভাবি নি। বললাম আমরা আরও অনেক জায়গায় যাব। রাস্তায় খাবার জলের প্রয়োজন হবে। বালতি করেও জল নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। কাজেই আমি এটা তাঁকে দিতে পারছিনা বলে দুঃখিত। মানুষগুলির সরলতা দেখে অবাক লাগল।

বদ্রীনাথ থেকে নীলকণ্ঠ পর্বত

আবার হাঁটতে শুরু করে কিছুক্ষণের মধ্যেই মানা গ্রামে এসে উপস্থিত হলাম। আই.টি.বি. পুলিশ ক্যাম্পের উল্টো দিকের একটা চায়ের দোকানে বসে অন্ততঃ বছর কয়েকের পুরনো চানাচুর কিনে, চা করতে বললাম। চানাচুরই এই দোকানের একমাত্র খাদ্যবস্তু। আমরা চায়ের অপেক্ষায় বসে আছি। বসে আছে আই.টি.বি. পুলিশে পোস্টেড দু'জন ভদ্রলোক। একজনের বাড়ি বেনারস, অপরজন বিহারের লোক। তারা আমাদের সব কথা শুনে বলল, আমাদের ক্যামেরাটা জামার তলায় ঢুকিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। ওপর থেকে দেখা না গেলে, কেউ সার্চ করতো না। ভাবলাম একই কাজে নিযুক্ত দু'জন কী চমৎকার দু'রকম কথা বলছে। ধন্য আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা! সাহস একটু বেড়ে গেল। পুলিশ ক্যাম্পকে সাক্ষী রেখে, দূরের গ্রামের ছবি নিলাম। দোকানদার এখনও চা তৈরি করছে। হঠাৎ দেখি পাথরে থেঁতো করে, সে কী যেন চায়ের কেটলিতে দিয়ে দিল। পরিমাণেও অনেকটা। জিজ্ঞাসা করতে দোকানদার জানাল, মশলা। ভাবলাম এখানকার অনেক চায়ের দোকানের মতো, এলাচ বা গরম মশলা জাতীয় কিছু দিয়েছে। ও বাবা! চায়ে একটা চুমুক দিয়েই অবস্থা শোচনীয়। খাবে কার সাধ্য! একগাদা গোলমরিচ চায়ে থেঁতো করে দেওয়া হয়েছে। জীবনে এই প্রথম ঝাল চা খেয়ে ধন্য হলাম! যাহোক, চা শেষ করে মন্দিরের পাশের হোটেলে ফিরে এলাম। অনেক বেলা হয়ে গেছে। পরটা আর চা খেয়ে, গেলাম শোণপ্রয়াগ যাওয়ার বাসের খবর নিতে। তীরথের কথা খুব মনে পড়ছে। আজ সকালে আমাদের ঘুম থেকে উঠতে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। ওর বাস খুব ভোরে বদ্রীনারায়ণ ছেড়ে চলে গেছে।

কেদারনাথ যেতে হলে, শোণপ্রয়াগ পর্যন্ত বাসে যাওয়া যাবে। খবর পেলাম বাস ছাড়ার ঘন্টাখানেক আগে টিকিট দেওয়া হয়। কেদারের রাস্তা খুব খারাপ হয়ে আছে। ওদিক থেকে কোন বাস আসছে না। ওদিক থেকে বাস এলে, তবে এদিকের বাসের টিকিট দেওয়া হবে। ঘরে ফিরে এসে দেখি একতলায় সিঁড়ির পাশে, বৃদ্ধ ভদ্রলোকের পাশের ঘরে, চার-পাঁচজন যুবক বসে আছে। পঞ্চভাই আর ওই বৃদ্ধ ভদ্রলোকও আছেন। বৃদ্ধ আমাদের কথা বোধহয় এদের আগেই বলেছেন। কারণ আমরা আসতেই তারা আমাদের ডেকে কথা বলতে শুরু করল। সবাই বাঙালি। দু'জনের বাড়ি আসানসোলে। ওদের মধ্যে দু'জন নাকি অমরনাথ ও কেদারনাথ হয়ে এখানে এসেছে। বাকীরা কেদারনাথেই প্রথম গেছিল। সেখান থেকে একটু আগে এখানে এসে পৌঁছেছে। একসঙ্গে অমরনাথ, ও কেদার-বদ্রী যেতে, আগে কারোর কথা শুনেছি বলে মনে করতে পারছি না। তবু মনটা বেশ পুলকিত হয়ে গেল। বাস তাহলে কেদারনাথ থেকে এসেছে। ওরা জানাল, মাঝ রাস্তায় ধ্বসের জন্য তাদের অনেকক্ষণ আটকে থাকতে হয়েছিল। গত দু'দিন কোন বাস আসে নি। কেদারনাথ থেকে আজই প্রথম বাস এসেছে তাদের নিয়ে। ওরা এখান থেকে নন্দন কানন, হেমকুণ্ড সাহেব যাবে। ওদের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়ে, আমরা কেদারের রাস্তার একটা মোটামুটি অবস্থা জেনে নিলাম।

প্রায় সন্ধ্যার সময় আবার বাস স্ট্যান্ডে গেলাম। সেই যুবকটিও তার কেদার যাবার জন্য শোনপ্রয়াগের দু'টো টিকিট কাটার টাকা দিয়ে দিল। কাউন্টারের ভদ্রলোক জানালেন, এই পথে প্রথমে যমুনোত্রী, তারপর গঙ্গোত্রী, তারপর কেদারনাথ হয়ে সব শেষে বদ্রীনারায়ণ যাওয়া সুবিধাজনক। তাই সকলে ঐ ভাবেই এই চার জায়গায় যায়। যারা শুধুমাত্র কেদার-বদ্রী যায়, তারাও প্রথমে কেদারনাথ গিয়ে, সেখান থেকে বদ্রীনারায়ণ আসে। কেদার থেকে বদ্রী আসার বাস অনেক আছে। আজ রাস্তা পরিস্কার হয়ে যাওয়ায়, ওদিক থেকে কিছু বাস এসেছে। আগামীকালও বেশ কিছু বাস আসবে। তবে এদিক থেকে সোজা শোনপ্রয়াগ যাওয়ার বেশি বাস নেই। কাল সকাল ন'টায় সোজা শোনপ্রয়াগ যাওয়ার একটাই বাস ছাড়বে, এবং সেটা সন্ধ্যাবেলা শোনপ্রয়াগ পৌঁছবে। কাল সারাদিনে ঐ একটাই ডিরেক্ট বাস, বা এখানকার ভাষায় "যাত্রাবাস" আছে। আর একভাবে আমরা যেতে পারি। সকাল ছ'টার বাসে রুদ্রপ্রয়াগ গিয়ে, ওখান থেকে শোনপ্রয়াগের বাস ধরতে পারি। পৌঁছতে পৌঁছতে সেই সন্ধ্যাই হয়ে যাবে। ভাবলাম দু'ভাবেই পৌঁছতে যদি সন্ধ্যা হয়ে যায়, তবে যাত্রাবাসেই যাওয়া ভাল। বাস বদল করবার ঝামেলা নেই, বসবার জায়গা না পাওয়ার ঝুঁকি নেই। সবশেষে জানা গেল, যাত্রাবাসের টিকিট এখন পাওয়া যাবে না - কাল সকাল আটটায়।

ফিরে এলাম। সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত্রি নামল। মাধব ও দিলীপ গেল মন্দিরে আরতি দেখতে। আমি সুটকেস গোছাতে বসলাম। বেশ কিছুক্ষণ পরে সঙ্গীরা ফিরে এসে আমার কাজে সাহায্য করতে শুরু করে দিল। সুটকেস ও কাঁধের একটা ব্যাগ গুছিয়ে রাখলাম। কাল সকালে হোল্ড-অল বেঁধে ফেললেই হবে। পঞ্চভাই একটা বদ্রীনারায়ণের মালা নিয়ে এল। আমাদের তিনজনের নামধাম ওর খাতায় টুকে নিল। নাম, বাবার নাম, গোত্র ইত্যাদি অতি প্রয়োজনীয় বিষয় জেনে নিয়ে, মন্ত্র পড়ে তিনজনকেই কপালে চন্দনের ফোঁটা পড়িয়ে দিল। হাতে খানিকটা করে পুজোর চরণামৃতও দিল। মাধব ও দিলীপ তাকে ভক্তিভরে প্রণাম করল। আরেকটু পরে হোটেলে গিয়ে রাতের খাবার খেয়ে এলাম। কিছুক্ষণ নিজেরা গল্পগুজব করে সময় কাটালাম। আজ একুশে আগষ্ট, বাড়ি থেকে দিন আষ্টেক হ'ল এসেছি। বাড়ির কথা খুব মনে পড়ছে। যে যার বাড়িতে চিঠি লিখে, শুয়ে পড়লাম।

(এরপর আগামী সংখ্যায়)

আগের পর্ব - ফুলের দেশে কিছুক্ষণ

বদ্রীনারায়ণ - এখন

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের অবসরপ্রাপ্ত অফিসার সুবীর কুমার রায়ের নেশা ভ্রমণ ও লেখালেখি। ১৯৭৯ সালে প্রথম ট্রেকিং – হেমকুন্ড, ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স, বদ্রীনারায়ণ, মানা, বসুধারা, ত্রিযুগী নারায়ণ, কেদারনাথ, গঙ্গোত্রী-গোমুখ ও যমুনোত্রী। সেখান থেকে ফিরে, প্রথম কাগজ কলম নিয়ে লিখতে বসা। ভ্রমণ কাহিনি ছাড়া গল্প, রম্য রচনা, স্মৃতিকথা নানা ধরণের লিখতে ভালো লাগলেও এই প্রথম কোন পত্রিকায় নিজের লেখা পাঠানো। 'আমাদের ছুটি' পত্রিকার নিয়মিত লেখক, পাঠক, সমালোচক এবার থেকে নেমে পড়েছেন কীবোর্ডে-মাউসে সহযোগিতাতেও।

কেমন লাগল : - select -

মত দিয়েছেন :

গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

ভালকি মাচানের ডাকে

তপন পাল

ভালকি মাচান - নামটা বড় সুন্দর।
'আমাদের ছুটি'-র ফেসবুক গ্রুপে ভালকি মাচান-এর একটা ছবি দেখে জায়গাটা সম্বন্ধে কৌতূহল জাগল। খোঁজখবর করে জানা গেল খুব দূরও নয় - বর্ধমান জেলার মানকরের কাছে।
জঙ্গল আমার খুব একটা ভালোবাসার নয়। আমাকে টানে জল - নদী, সমুদ্র, নিদেনপক্ষে দীঘি। যখন শুনলাম ভালকি মাচানের কাছে যমুনাদীঘি, আর মাচানে বসে বর্ধমানের রাজ পরিবারের সদস্যরা ভালুক শিকার করতেন তাই এই নাম, মনে হল গেলেই হয়।
তা জঙ্গলে যাওয়ার অনেক হ্যাপা। এটা কোরো না, ওটা কোরো না। বছর কুড়ি আগে, পুত্র একদিন স্কুল থেকে ফিরে বায়না ধরল - সে হাতি দেখবে। ঠিক আছে, সামনের রবিবার চিড়িয়াখানায় যাব'খন। না তা হবে না। পরিবেশ সচেতন পুত্র বাঁধা হাতি দেখতে চায় না - সে ছাড়া হাতি দেখবে।
খোঁজখবর করে কুলডিহায়। দূর থেকে হাতির দল দেখে পিতা পুত্র যখন উদ্বেল, সঙ্গী স্থানীয় লোকটি বললেন, এ আর কি, যদি দুটো তরমুজ আনতেন, হাতিরা আরও কাছে আসত। শুনে পুত্র বেঁকে বসল। হাতিকে তরমুজ না খাওয়ালে সেও আর কোনদিন তরমুজ খাবেনা। অগত্যা প্রত্যাবর্তন, এবং একমাস পরে পুনর্গমন; ধৌলির লাগেজ ভ্যানে এক বস্তা তরমুজ বুক করে।
তবে ভালুকদের সঙ্গে আমার চিরকালের একাত্মতা - তারা আমার মতই সর্বভুক - নিরামিষ-আমিষের প্রভেদ করে না এবং মাংস পেলে তা দ্বিপদ না চতুষ্পদের, চতুষ্পদ হলে সে ব্যা-ব্যা ডাকত না হাম্বা-হাম্বা তা নিয়ে মাথা ঘামায় না।
একটা কারণে অবশ্য আমি ভালুকদের সমঝেও চলি। স্কুলে একবার নস্যি নেওয়া, ধুতি পরা সংস্কৃত স্যার 'ঋক্ষ' শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তাঁর নাকি সুরের জন্য আমি শুনেছিলাম 'বৃক্ষ'। বলেছিলাম - 'গাছ'। শুনে ভদ্রলোক আমাকে একবার পেটালেন, পরদিন বাজারে দেখা হতে বাবাকে বললেন - আপনার ছেলে পড়াশোনা কিছু করছে না - শুনে বাবা বাড়ি ফিরে আরেকবার।
অতএব ভালকি মাচান না গিয়ে উপায় নেই।
কিন্তু যাওয়াটা সহজ নয়।
হাওড়া থেকে সরাসরি মানকর যাওয়ার তিনটি মাত্র রেলগাড়ি - ২২৩৮৭/২২৩৮৮ ব্ল্যাক ডায়মন্ড, ১৩০৪৯/১৩০৫০ অমৃতসর এক্সপ্রেস, লোকে যাকে ভালোবেসে বারাণসী বলে ডাকে আর ১২৩৩৯/১২৩৪০ কোলফিল্ড। এদের মধ্যে দ্বিতীয় গাড়িটা সম্বন্ধে যত কম বলা যায় ততই ভালো। কোলফিল্ডে সময়টা সবচেয়ে কম লাগে কিন্তু ব্ল্যাক ছাড়ে একেবারে ভোরে - ১৪৪ কিমি যেতে লাগে সোয়া দু'ঘন্টা - মন্দের ভালো আরকী। অগত্যা ব্ল্যাক। ফিরব কিসে? ভেবেচিন্তে ৯ কিলোমিটার দূরের পানাগড় থেকে ১৩০৫২ হুল এক্সপ্রেস ধরা সাব্যস্ত হল। ইনিও খুব সুবিধের গাড়ি নন। ১৫৪ কিমি যেতে তিনি সময় নেন তিন ঘন্টা, কিন্তু ভাড়া ব্ল্যাক ডায়মন্ডের চেয়ে কম - ৩০৫-এর বদলে ২৮৫।
রবিবার, ১২ অক্টোবর, সকালবেলা হাওড়া। অতি দীর্ঘ ব্ল্যাক ডায়মন্ড আট নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে। ছাড়ল সোয়া ছ'টায়। শেওড়াফুলি, ব্যান্ডেল, বর্ধমান পেরিয়ে ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে মানকর। ঘড়িতে তখন আটটা আটত্রিশ। বলে রাখা ভাল সারা রাস্তায় জুতো পালিশ ছাড়া কোন হকার ওঠেনি। ওমলেট, টোষ্ট তো দূরস্থান, শশা, মুড়ি এমনকী চা-ও মেলেনি।
অপর বাতানুকূল কামরাটি থেকে এক পরিবার নামল - বাবা, মা আর একটি বছর চারেকের কন্যা। প্ল্যাটফর্মে নেমেই মেয়েটি বমি করে ফেলল। আমি অবাক হয়ে ভাবলাম পেট খালি থাকায় আমি অসুস্থ বোধ করছি, আর ছোট মেয়েটিকে রাত থাকতে ঘুম থেকে তুলে সারা রাস্তা বাবা-মা এমন খাওয়াতে খাওয়াতে এনেছে যে তার জেরে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। হায় রে, জীবন কেন যে এত বৈপরীত্যে ভরা!
দু-নম্বর প্ল্যাটফর্মে নেমেছিলাম। তার গা দিয়েই রাস্তা। কিন্তু যানবাহন কিছু চোখে পড়ল না। উল্টোদিক দিয়ে বেরিয়ে দেখি কয়েকটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। তারই একটার সঙ্গে কথা বলে ঠিক হল ভালকি মাচান দেখিয়ে আমাকে তিনটের মধ্যে পানাগড় স্টেশনে নামিয়ে দেবে - দক্ষিণা আটশ টাকা।
গ্রামের পথ ধরে গাড়ি এগোয়। ইতিমধ্যে দেশলাই কেনার জন্য পথের ধারে একটা ছোট দোকানে থামি। দোকানদার অনুপস্থিত। বেশ কিছুক্ষণ বাদে তিনি এলেন - শ্মশ্রুশোভিত এক বয়স্ক ব্যক্তি। 'কি গো কাকা, কোথায় ছিলে?' - 'আর বোলো না কো, হাতি বেরিয়েছে' - তাঁর নির্বিকার জবাব। জিজ্ঞাসা করে জানা গেল দলছুট এক পুরুষ প্রাপ্তবয়স্ক হাতি গ্রামে ঢুকে পড়েছে। 'যাও না' - এখান থেকে এক কিলোমিটার হবে। ওয়াচটাওয়ারের নিরাপদ উচ্চতা থেকে হাতি দেখতে ভালো লাগে। তাই বলে মুখোমুখি, একই জমিতে!! বন্যেরা বনে সুন্দর, হাতিরা ছবিতে।

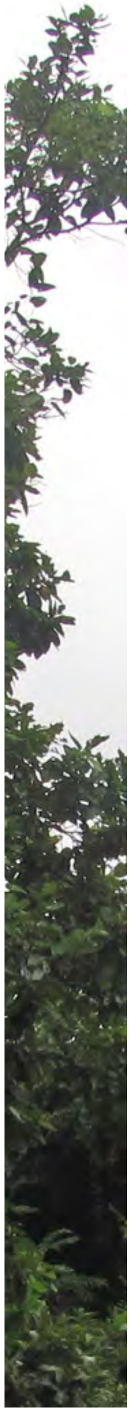

রাস্তার ধারেই মাচান, ইঁটের বেশ উঁচু একটি কাঠামো, সংস্কারাভাবে জীর্ণ। তার শিখর থেকে আকাশের দিকে ডানা মেলেছে উদ্ধত এক ন্যগ্রোধ। আয়লা, গিরি, থানে, নীলম, ফিলিন, হুদ হুদ......আর কতদিন মাচান যে মাথা তুলে থাকতে পারবে কে জানে! মাচানের গোড়ায় এক গভীর গর্ত, তার মুখে লোহার এক শক্তপোক্ত জাল; ওই মাচান থেকে বর্ধমান রাজবাড়ি (২৫ কিমি) গুপ্ত সুড়ঙ্গপথের গল্পের উৎসমুখ।

ঠিক বিপরীতে একটি বেসরকারি রিসর্ট - বিস্তৃত এলাকা জুড়ে উই ঢিপি, পুকুর, ফুল, পাতাবাহার আর অযত্নলালিত বনস্পতিকুল। ততক্ষণে বৃষ্টি থেমেছে, বৃষ্টিস্নাত সকালে অরণ্যের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাওয়ার অনুভব আলাদা, খুব ভালো লাগছিল। সেখানকার বাগিচাকর্মীদের জিজ্ঞাসা করে জানা গেল যমুনা দীঘি বেশ দূরে। আর ভগ্নপ্রায় মন্দিররাজি ভালকি গ্রামে। দুটো জায়গাই হেঁটে যাওয়ার পক্ষে অনেকটা দূর। গাড়ি নিয়েই যেতে হবে। ড্রাইভার বাবাজীবনকে সে কথা বলতেই বলে আরও পাঁচশ টাকা লাগবে। কিন্তু তখন কীই বা আর করা যায়। অগত্যা...

রাস্তায় দু-হাত পর পর মা কালীর ভক্তদের চাঁদার জন্য উৎপাত। জনা দশেক যুবক, রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে দশ টাকার দাবি নিয়ে। সারাদিনে ওই রাস্তায় কটা গাড়ি চলে; কত টাকা আদায় হয়; তার চেয়ে যদি এরা এই ভরা মরশুমে মাঠে কাজ করত, বেশি রোজগার হত। কিন্তু গ্রাম বাংলার কর্মবিমুখ, অলস, আমোদকামী যুবকরা কবে আর খেটে খেয়েছে!

ভালকি বেশ বর্ধিষ্ণু গ্রাম। ধানক্ষেত, পুকুর, সদ্য রঙ হওয়া দোতলা বাড়ি, বাড়ির সামনে দ্বিচক্রযান এবং/অথবা ছোট চার চাকার গাড়ি। গ্রামে ঢোকার মুখে রাস্তার ওপরে সেলফোনের দোকান। এসব দেখে গ্রামীন সমৃদ্ধির একটা ধারনা পাওয়া যায়। এতদসত্ত্বেও মন্দিরগুলি জীর্ণ; ভগ্নপ্রায়, ফাঁসির আসামীর মত দিন গুনছে। বোঝা গেল গ্রামের একদা ভূস্বামী পরিবারটির অবস্থা এখন পড়তির দিকে। কিন্তু গ্রামবাসীরাই বা কেন চাঁদা তুলে মন্দিরগুলি সারায় না। সম্ভবত, একদা ভূস্বামী পরিবারটি অদ্যাবধি অতীত গরিমার জ্যোতিতে আত্মমগ্ন - বাড়ানো হাত ধরতে হয়ত অনীহা। তবুও মন্দিরগুলির দিকে তাকালে চোখ জুড়িয়ে যায় - মনের কোনে ভেসে ওঠে অতীত গরিমা ও বৈভবের দিনগুলি। জোড়া শিব ও জোড়া বিষ্ণু মন্দির, কারুকার্যখচিত নাট মন্দির। নাট মন্দিরে মা দুর্গার কাঠামো। ঢোকার মুখে বারোয়ারিতলা - সেখানে মা জগদ্ধাত্রী...।

মনটা খারাপ হয়ে গেল এইসব দেখে। কিন্তু জুড়িয়ে গেল যমুনাদীঘিতে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৎস্যদপ্তরের অধীন এক বিস্তীর্ণ খামার - পর পর পুকুর, দূরে বৃক্ষচিহ্নিত বাঁধ - খামারের সীমানা, তারপর সবুজ ধানক্ষেত আর মাথার ওপরে শরতের নীলিমা। দূর থেকে দেখা গেল একটা পুকুরের এক জায়গায় জল চঞ্চল। এক বন্দুকধারী প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ওখানে জলে কী ফেলেছে গো?' 'কোথায়?' 'ওই যে জল ফুটছে'। 'কিছু ফেলে নি'। জানতে পারলাম মাছকে খেতে দেওয়ার সময় হয়েছে, তাই মাছেরা একজায়গায় জড়ো হয়েছে।

তারপর পুকুরের পর পুকুর, অভিনীত হতে থাকল সেই একই দৃশ্য। মাছেরা পাড় ঘেঁষে এক জায়গায় জড়; খাবার দেওয়ার লোকটিকে পুকুরপাড়ে দেখামাত্র পাখনা নাড়িয়ে উল্লাস, তারপর গামছায় ঢেলে মৎস্যখাদ্য পুকুরে ছুঁড়ে দেওয়া মাত্র কাড়াকাড়ি, একটি মাছকে অপর মাছেরা তলা থেকে ঠেলে তুলে দিয়েছে জলের ওপরে। খাবি খেয়ে তার কী দুরবস্থা!

বেশ কিছুক্ষণ কাটল সেথায়, মহানন্দে, বিস্তৃত প্রান্তরের মাঝে।

বেরিয়ে পড়লাম তখন মাত্র সাড়ে এগারটা। আমার ফেরার গাড়ি পানাগড় থেকে তিনটে বাইশে। এতক্ষণ কী করব! ড্রাইভারটিকে বললাম, 'ডোকরাগ্রাম' এবং দুর্গাপুরের অজয়পাড়ে ইছাই ঘোষের দেউল দেখাতে। কিন্তু সে প্রবল অনিচ্ছুক। গ্রামের ছেলে হয়েও সে মাঠে কাজ করে না, গাড়ি চালায়; তাই তার ধারণা সে ভদ্রলোক শ্রেণীর অন্তর্গত, সেকথা সে বার বার জোর দিয়ে বলছিল। যদিও তার নিজের কথাতেই, বাজার খারাপ, মানকরে অনেক গাড়ি হয়ে গেছে; প্রতিদিন ভাড়া জোটে না। মধ্যে মধ্যে সারা সপ্তাহ বসে থাকতে হয়, কারণ স্থানীয়রা গাড়ি ভাড়া করেন মূলত অ্যাম্বুলেন্স হিসেবে - দুর্গাপুরে ডাক্তার দেখাতে যেতে বা রোগী ভর্তি করতে। তাসত্ত্বেও বাবু শ্রেণীভুক্ত হওয়ার কারণে সময়ে আহার ও বিশ্রাম তার কাছে বড়ই গুরুত্বপূর্ণ।

অগত্যা পানাগড়। স্টেশনের ধারে কাছে ঘোরাঘুরি করে একটা ভাতের হোটেল পাওয়া গেল। ভাত ডাল খেয়ে স্টেশনে - সবে একটা বাজে। দু নম্বর প্ল্যাটফর্মে হাওড়াগামী গাড়ি আসবে। প্লাগে সেলফোন চার্জ হতে দিয়ে জাঁকিয়ে বসা গেল। ট্রেন আসছে...যাচ্ছে...। স্টেশনের পানীয় জলের ট্যাঙ্কটি ১৮৯৯ সালে ই.আই.আর (ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়েঃ ১৮৪৩ সালে লন্ডনে নিবন্ধীকৃত) দ্বারা নির্মিত। কে

জানে তার পর থেকে একবারও পরিস্কার করা হয়েছে কীনা। কিন্তু সঙ্গের জল শেষ। ঘুমন্ত স্টেশনে জলের বোতল কেন, চা অবধি পাওয়া যাচ্ছে না। অগত্যা ওই জলই সই। অবশেষে আমার গাড়ি এল। বাতানুকুলিত কামরায় উঠে জল, চা, ঝালমুড়ি সবই পাওয়া গেল। লিলুয়ায় কিঞ্চিৎ বিরতি দিয়ে হাওড়া ছ'টা পঁয়তাল্লিশ।

পশ্চিমবঙ্গ অডিট ও অ্যাকাউন্টস বিভাগের কর্মী তপন পাল বোম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটি এবং ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ফ্যান ক্লাবের সদস্য। ভালোবাসেন বেড়াতে আর ছবি তুলতে।

কেমন লাগল : - select -

মত দিয়েছেন :

গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

[আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন]

© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu

পাহাড় পানির দেশে

মো: মহিউদ্দিন

গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে। এখনও আমাদের এইযাত্রার গাইড নুরভাই এসে পৌঁছাননি। খবর পেয়েছি তিনি অটোতে করে গাড়ি ধরতে ছুটেছেন। ততটা উদ্বিগ্ন হচ্ছিনা অবশ্য - আর যাই হোক যাত্রাবাড়ির জ্যাম পেরোতে আমাদের একঘন্টাতো লাগবেই। অবশেষে কমলাপুর এসে নুরভাই আমাদের ধরে ফেললেন। ঈদের আগে যাচ্ছি, শেষ মুহূর্তে বাসের টিকিট করাতে একেবারে পিছনের সিটগুলোই জুটেছে। জ্যাম ছাড়তেই প্রায় রোলার কোস্টার এর মত ছুটে চলেছি। রাত দশটায় ছেড়ে ভোরে সূর্য ওঠার আগেই আমাদের নামিয়ে দিল রাঙ্গামাটি বাস স্ট্যান্ডে। রাতে ঘুমানো তো দূরের কথা বাস থেকে নেমে আগে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো ঠিকঠাক আছে কিনা দেখে নিলাম। হাতমুখে পানি নিয়ে নাস্তা সারলাম ডাল পরটা আর ডিমে। আমাদের গন্তব্য ছোট হরিনা, যেতে হবে পানি পথেই। কাপ্তাই ও কর্ণফুলীর বুক চিরে কিছু ছোট ছোট লঞ্চ চলাচল করে। খুব সুন্দর এই লঞ্চগুলো। দোতলাটা কাঠের ফ্রেমের, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ভাল লাগল। প্রথম দিকে স্থানীয় মানুষরা অপরিচিত আমাদের দেখছিলেন কৌতূহলী দৃষ্টিতে। খুব বেশীক্ষণ অপরিচিত থাকতে হলনা অবশ্য, বেগ ভাই তাদের সঙ্গে দিব্যি গল্প জুড়ে দিলেন। আমরাও জুটে গেলাম। ৭:১০ এ লঞ্চ ছাড়ার আগে বাজার থেকে বেগ ভাই কয়েকটা কমলা আনলেন, খেলাম - মন ভাল হয়ে যাবার মত টক!!

কাপ্তাই প্রথম দেখছি। সকালের রোদে মায়াবী লাগছিল ছোট ছোট পাহাড়ে ঘেরা এই বিশাল সবুজ জলরাশি। কৃত্রিম এই লেকের পানি মনে হচ্ছে যেন মাছের অভয়ারণ্য। কিছু জেলেকে মাছ ধরতে দেখা যাচ্ছে। হালকা বাতাসে মৃদু ঢেউ উঠছে টলটলে পানিতে। পর্যটন আকর্ষণ পেদা টিং টিং, শুভলং ঝরনা পার হয়ে বরকলের দিকে ছুটছি। এদিকটাতে গুগুল-এ আগেই দেখেছিলাম অসংখ্য ছোট ছোট দ্বীপের ফাঁকে ফাঁকে পানি লুকিয়ে আছে। এক কথায় অসাধারণ। মনে হল কোন একটা দ্বীপে ঘর বেঁধে থেকে যাই। ভারত থেকে আসা কর্ণফুলী নদীতে এখন আমরা। বরকলের পাহাড়গুলো একটু বড় বড়ই মনে হল। পাহাড়, নদীর মিশ্রণে বর্ণিল আকাশ দেখতে দেখতে আঁকা বাঁকা পাহাড়ি পানি পথে কলাবইন্না, গোরস্থান, ভুশনছড়া পার হয়ে দুপুর ১২:০৬-এ পৌঁছলাম ছোট হরিনায়। ছোট একটি বাজার ও অদেখা বিজিবি ক্যাম্প, দুপাশে ছোট বড় পাহাড় আর পাশেই বয়ে চলা কর্ণফুলী নদী এই হল ছোট হরিনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। লঞ্চ থেকে নেমে বিজিবি ক্যাম্পে সরল আত্মসমর্পণ। আমাদের দেখে নিতান্তই অবাক হয়ে নানারকম প্রশ্ন করলেন তাঁরা। হাসিমুখে একে একে সব উত্তর দিলেও তাদের বোঝাতে হয়ত পারলাম না আমাদের ভ্রমণের উন্মাদনা। ঈদের সময় কেউ কি এই অজপাড়ায় আসে?? নাম ঠিকানা বিস্তারিত জমা দিয়ে ঘণ্টা খানেক পর ছাড়া পেলাম তাদের কাছ থেকে।

থাকার ব্যবস্থা বলতে বাজারে দুটো মেসের মত আছে কবির ও এমদাদ ভাইয়ের। তবে তাদের কাউকে খুঁজে পাওয়া গেল না। কিছু না পেয়ে একটা খাবারের হোটেলে ঢুকলাম। বাহ! এখানে খাবারেরও মহামারী হত যদি আরও একটু দেরি করতাম। তবে তৈরি ছিলনা, রান্না করে দেবে, তাও ভাল। দোকানে বসেই ঝিমোতে লাগলাম। থাকার ঠিকানা এখনও বিরল। নুর, ডায়না ঘুমের সাগরে আর দুপুরের তীব্র গরম ও শরীরের ক্লান্তিকে কর্ণফুলীর জলে ভাসাতে চলল বেগ ভাই। দুপুরের খাবার তৈরি হলে নুর, ডায়নাকে ডেকে ডাকতে গেলাম বেগ ভাইকে, দেখলাম ভাইয়া পানিতে না লঞ্চ থেকে হাসি মুখে নামছে। লঞ্চের সবার সাথে সখ্যতা আগেই হয়ে গিয়েছিল, সেটাকেই সাঙ্গ করে তাদের সঙ্গে রাত কাটানোর ব্যবস্থা করে এসেছেন। অগত্যা খাওয়া শেষ করে গৃহ প্রবেশ করলাম - সঙ্গে থাকা তাঁবু দুটো লঞ্চের পেছনের ছাদে টাঙিয়ে ফেলে। সবাই একটু অবাক হয়েই দেখছিল আমাদের, যেমনটা আমরা সার্কাসে গিয়ে দেখি আরকী। ঘরবাড়ি টাঙিয়ে, প্রতিবেশীদের সঙ্গে মিশে গেলাম। বিকেলে ক্লান্ত শরীর কর্ণফুলীর শীতল পানিতে এক অন্যরকম প্রশান্তির সন্ধান পেল। চায়ের সঙ্গে জমে উঠল সান্ধ্য আড্ডাও। ফুরফুরে মন নিয়ে আড্ডার ফাঁকেই ডায়নাকে নিয়ে নুর চলল ঈদের বাজার আর রাতের খাবার কেনাকাটা করতে। ফিরে এল সকালের জন্য দুধ, সেমাই, চিনি ও রাতের জন্য গোল আলু ও ডিম নিয়ে!!! লবণ দিয়ে ডিম ও আলু সেদ্ধ। খোলা আকাশের নীচে এমন খাবার, সত্যি বলতে কী ভালোই লাগলো। পূর্ণিমা না হলেও চাঁদ তার রাজত্ব সাজাতে শুরু করেছে। রাতের আকাশ সেজেছে নক্ষত্রের সমারোহে। রাত জাগা পাখি ও আমরা ক'জন ছাড়া মায়াময় এই পৃথিবীতে সবাই-ই যেন ঘুমিয়ে পড়েছে।
আকাশের তারা দেখতে দেখতে চোখের পাতা ভারি হয়ে এল আমাদেরও।

নদীর কোলে, কুয়াশার চাদর গায়ে দেওয়া ঘুম ভাঙ্গতে একটু কষ্ট হল। ভোরের পাখির কলকাকলিতে সকালটা ভালই লাগছিল। নদীর বুকে মেঘ এখনও ঘুমিয়ে। সূর্য এখনও কুয়াশার আবডালে ঢাকা। আজ ঈদুল আযহা, কোরবানির ঈদ। বেগ ভাই ও নুর ভাইকে নিয়ে নামাজ পড়তে ছোট বাজারের বড় মসজিদে গেলাম। মায়ের কাছে শুনেছি এই ঈদে খালি পেটে নামাজ পড়তে যেতে হয়, নামাজ শেষে বাসায় এসে খেতে হয়। নামাজ শেষে ভ্রাম্যমাণ বাড়িতে ফিরে দেখি ডায়না সেমাই ও নুডলস রান্না করে আমাদের অপেক্ষায় রয়েছে।

লঞ্চ আজ ফিরবেনা, সারা দিন এখানেই কাটাতে হবে। বিজিবি কর্মকর্তারা কাল থেকে আমাদের একরকম নজরবন্দী করে রেখেছিলেন। আজকেও সকাল সকাল দেখা করে আমাদের তাঁবুবাড়ি দেখে প্রশংসাও করলেন। পাহাড়ের দিকে যেতে নিষেধ করলেও ওপারে বাঙালির গ্রামগুলো দেখে আসার পরামর্শ দিলেন। ওদিকটাতে যাওয়ার বাহন বলতে কিছু মটোর সাইকেল আছে। নিতান্তই একটা পায়ে চলা পথ। আজ সারা দিন হাঁটব বলেই প্রস্তুত হলাম। আমাদের ক্রুজের ইঞ্জিনিয়ার সুমিত চাকমা ভাই আমাদের সঙ্গে পা বাড়ালেন। গ্রাম যেহেতু আছে, ঘরবাড়ি তো থাকবেই, ঘরবাড়ি যদি থাকে মানুষতো থাকবেই। তাই খালি হাতে যেতে ইচ্ছা হল না। এক বড় বোয়াম চকলেট সাথে নিয়ে নিলাম। আমাদের পাঁচ জনের ঈদ যাত্রায় যত ক্ষুদে বন্ধুদের পেলাম সবাইকে মিষ্টি মুখ করাতে করাতে এগোলাম। তাদের কেউ কেউ ছিল অবাক, কেউবা ভীত, কেউ কেউ কৌতূহলী হয়ে চেয়েই রইল। তবে হাতে চকলেট পাওয়ার পর সবাই আমাদের হাসি মুখেই বিদায় জানাল। নিজেদের ঠিক রবি ঠাকুরের 'কাবুলিওয়ালা'র মত লাগছিল। আনন্দ বিলানোর মত আনন্দ কমই আছে।

শহরের নিরেট যান্ত্রিকতার ভিড় ভুলে সবুজের মেলায় হাঁটছি। বর্ষা শেষ, শরৎও বিদায় চাইছে, নদীর পানি এখনও পরিপূর্ণ। দোয়েল, শালিক, কোকিল, ঘুঘু, চড়াইয়ের ডাকে মুখরিত চারিদিক। গাছপালায় সবুজ পাতা যেন সেজেছে ঈদের সাজ। টুকরো টুকরো মেঘের ফাঁকে লুকোচুরি খেলছে সোনালি রোদ। প্রকৃতির এই মোহিনী সৌন্দর্য সুধায় মাতোয়ারা হয়ে আমরা পাঁচ অভিযাত্রী হেঁটে চলেছি আর গলা ছেড়ে গাইছি প্রাণের গান।

চলতি পথে অনেকগুলো বাড়ি পড়ল। প্রায় প্রতিটা বাড়িতেই খাওয়ার নিমন্ত্রণ পেলাম। তাই আরও নিশ্চিন্তে হাঁটতে লাগলাম। পথে যেতে যেতে মালিকের অনুমতিতে গাছ থেকে ডাব পেড়ে তা কিনে নিয়ে প্রাণ ভরে তৃষ্ণা মিটিয়ে নিলাম। সেই বাড়িতে ঘুঘু মারার ফাঁদ দেখারও সুযোগ হল। অভিনব কায়দা - বলা যায় ধোঁকা দিয়ে ঘুঘু ধরা। ব্যাটায় ডজন খানেক ফাঁদ বানিয়েছেন যার প্রতিটাতে একটি করে ঘুঘু। ব্যাপারটা খারাপ লাগলেও অপরিচিত জায়গায় ওনাদের বাড়িতে বসে আর এর বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারলামনা।

পথ এবার পাহাড়ি রূপ নিল। হঠাৎ ভর দুপুরে ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক শুনতে পেলাম। গাছ এখানে ঘন হয়ে এসেছে। রোদের আলো গায়ে পড়ছে না, গাছের বাধায়। শীতল একটা অনুভূতি বয়ে নিয়ে এল নদীর বাতাস। গল্প করতে করতে হেঁটে চললাম। গা ছমছমে এই পথ পাড়ি দিয়ে ভূশনছড়ায় পৌঁছলাম। অবশিষ্ট চকলেট বিলিয়ে দিলাম বাজারে থাকা ক্ষুদে বন্ধুদের। পাহাড়ি, বাঙালি উভয়েরই দোকান আছে এ বাজারে। গাঁয়ের মেঠোপথের দুধারে গড়ে ওঠা কয়েকটা দোকান নিয়ে ভূশনছড়া বাজার। আজ ঈদ হলেও বাজারে খুব বেশি লোকজন চোখে পরলনা। একটা দোকানে বসে চা পান করে ফিরতি পথ ধরলাম। এ গাঁয়ের এক শুভাকাঙ্ক্ষী তাঁর বাড়িতে দুপুরের খাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়ে রেখেছিলেন। খানিক এগোতেই দেখি বেগভাই কার সঙ্গে যেন হাত মেলালেন। কাছে গিয়ে দেখলাম আমন্ত্রণদাতা সেই ভদ্রলোক!!! চলে যাচ্ছেন কোন এক কাজে। ঈদে গরম গরম গোস্ত খাওয়ার স্বপ্নও মনে হল তাঁর সঙ্গে উধাও হয়ে গেল। ওনারইবা দোষ কী? ঘড়িতে তিনটে অনেক আগেই বেজে গেছে। যাক বিমর্ষ মন নিয়ে আমাদের লঞ্চের দিকেই চললাম। তারমধ্যেই নুরভাইয়ের উদ্যোগে নিমন্ত্রণ জুটে গেল আরেকটি বাড়িতে। মাটির ভিটাটা অনেকটা উঁচুতে। গাছের ছায়ায় ভরদুপুরেও ঠাণ্ডা পরিবেশ। এক বোল ভাত, গরম, খাশির সবজি ও ডাল আমাদের সামনের হাজির করলেন এমদাদ ভাই, যাঁকে খুঁজেছিলাম গতকাল কটেজের জন্য। 'আমার কটেজে যেহেতু আপনাদের রাখতে পারি নাই তাই এক বেলা খাওনোর খুব ইচ্ছে ছিল আপনাদের', এমনটাই বললেন এমদাদ। খুব অবাক হলাম এভাবে সব মিলে যেতে দেখে। আসলে এটাই তো হবার কথা। হ্যাঁ, আমার বাংলাদেশ এমনই।

সন্ধ্যা হয়ে গেল ফিরতে ফিরতে। ফেরার পুরো পথটুকু এমদাদ ভাই আমাদের সঙ্গেই এলেন। নদীর এপার থেকে দেখতে পেলাম আমাদের লঞ্চ বাড়ি। অনেকটা পরিচিত হয়ে গেলাম এই ছোট হরিনার সঙ্গে। সূর্য ততক্ষণে ডুবে গেছে। পাখিরা ফিরেছে নীড়ে। আমরাও ফিরে এলাম লঞ্চে। সন্ধ্যায় বিজিবির কর্মকর্তারা আরেকদফা সাক্ষাৎ করে গেলেন। রাতে সেই দুপুরের খাবার ক্রুজের সবাইকে নিয়ে উৎসবের মত করেই খেলাম। কাল সকালে ভোরে লঞ্চ ছুটবে রাঙ্গামাটির দিকে। আমাদের গন্তব্য শুভলং। লঞ্চ ধরার কোন টেনশন নেই, তাই ঘুমাতে যাওয়ার তাড়াও নেই। রাতের আকাশে চাঁদ, তারা আর মেঘেদের লুকোচুরি খেলা। মৃদু কুয়াশাও আছে। সবাই ঘুমের দেশে। এমনি এক মহেন্দ্রক্ষণে আমরা হারিয়ে গেলাম পুরনো স্মৃতির পাতায়। মনের সিন্দুক থেকে একে একে বের হয়ে এলো হারিয়ে যাওয়া কিছু ঘটনা। প্রকৃতি ও বন্ধুর কাছে মনটা হালকা করে, এক ভিন্ন ঈদের আনন্দ নিয়ে ঘুমোতে গেলাম।

সকাল হল সারেং ভাইয়ের ডাকে। ০৫:৩০ ঘড়িতে, আজ ছোট হরিনা ছেড়ে যাবে লঞ্চ। আমরা যাব শুভলং পর্যন্ত। ৬ টায় ছাড়বে। লঞ্চের ক্যান্টিন পরিচালক মোসলেম ভাই নিয়ে এলেন গরম গরম চা। চা হাতে তাঁবু থেকে বেরিয়েই চোখ-মন জুড়িয়ে গেল আরও একবার কর্ণফুলীর বুকে সকাল দেখে। নদী, পাহাড় ও কুয়াশার এক মায়াবী মিশ্রণ। হাজার হাজার শালিক চড়ুই ব্যস্ত সারা দিনের পরিকল্পনায়। তাদের কলকাকলীতে সরব হয়ে উঠেছে ছোট হরিনা, মনে হচ্ছিল যেন আমাদের বিদায় দিতেই এই আয়োজন।

টুং টাং, বেজেই যাচ্ছে ফোন। একে একে তেত্রিশটা মুঠো বার্তা। ঈদের শুভেচ্ছা জানালো সবাই, একদিন পরে পেলাম। ওদিকে নূর ভাইয়ের ফোনে শামিমের কণ্ঠ শোনা গেল। আজ তাদের বরকল আশার কথা তান্নিকে নিয়ে। আমাদেরও বরকল নামার কথা ছিল। তবে মারিসশা যেহেতু আমাদের আজকের গন্তব্য তাই আগে শুভলং জেতে হবে, ওদেরকেও ওখানেই নামতে বললাম। অল্প কিছু নাস্তা কিনে নিলাম বরকল বাজার থেকে।

একে একে লঞ্চের সবার কাছে বিদায় নিয়ে শুভলং নামলাম। মারিসশার লঞ্চ আসতে একটু সময় লাগবে। পাহাড়ি এলাকা এই শুভলং। পাহাড়িদের কাপড়ের দোকান চোখে পড়ল। মোটামুটি বড় বাজার। প্রচুর পর্যটক আসে বলেই হয়তো। কিছু কেনাকাটাও হল। হাতে আরও সময় আছে তাই খাড়া পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করলাম। শুধুই চড়াই তাই ক্রমশ ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। তার ওপরে সূর্যের তাপও প্রচণ্ড। নীচে নেমে আসতেই লঞ্চ চলে এল। স্থানীয় লঞ্চ, মানুষে বোঝাই হয়ে আছে। কোন রকমে আগুপিছু হয়ে বসে ছুটলাম কাপ্তাই এর অবারিত জলরাশির মন মাতানো ভুবনে। শুভলং-এর পাহাড় থেকে দেখা যাচ্ছিল কাপ্তাই-এর বিস্তৃত নীল রাজত্ব। মাঝে মাঝে ছোট ছোট দ্বীপ। ছোট এই লঞ্চটি দ্বীপগুলোর পাশ কাটিয়ে ছুটে চলল বাঁধন হারা পথে। সাধারণ মানুষের কৌতূহলী প্রশ্নের উত্তর দিতে যেয়ে তাদের সঙ্গে গল্প-গানে মেতে উঠলাম কিছু পথ। স্বচ্ছ পানির নীচের শেওলা, ছোট ছোট পানির গাছ দেখা যাচ্ছে বেশ স্পষ্ট। তার ফাঁকে ফাঁকে লুকোচুরি খেলছে লেকের বাসিন্দা মাছের ঝাঁক। দারুণ উপভোগ্য। লেকের স্বচ্ছ পানি পূর্ব দিকে মিশেছে বরকলের পাহাড়ের গায়ে। বরকলের এই পাহাড়ের রেঞ্জটা মারিসশা পর্যন্ত গেছে। ইচ্ছে হচ্ছিল সেই দুর্গম পথে পাড়ি দিই। সচরাচর কেউ এ পথে যায়না, তবে পাহাড়িদের সঙ্গে সেটেলারদের খারাপ সম্পর্কও এর একটা কারণ। তাই স্থানীয় লোকজন আমাদের বারণ করেছিলেন। তবে আমাদের বিশ্বাস এই পাহাড়ে যাঁরা বাস করেন, অন্যান্য জায়গার মতই তাঁরা ভালো ব্যবহারই হয়ত করতেন। সেই আশা নিয়েই হয়ত পরবর্তী কোন এক সময় আবার আসব। ঈদের দ্বিতীয় দিন, আজ সেজেগুজে মানুষ আত্মীয়ের বাসায় যাচ্ছেন। সেজেছে এখানকার প্রকৃতিও, অসাধারণ রূপে সেজেছে আমার দেশ, মনের অজান্তেই গুনগুন করে গান গাইছিলাম আর ক্যামেরার চোখে কিছু মুহূর্ত ধরে রাখার চেষ্টা করছিলাম।

পথে ছোট বড় কয়েকটা দ্বীপে থামল লঞ্চটি। বিকেলের দিকে লোক কমে গেল অনেকটাই। জায়গা নিয়ে বেশ আয়েশ করেই বসলাম এবার। লেক এখানে সরু নদীতে বদলে গেছে। দুপাশে ধান খেত, মাঝে মাঝে গ্রামের ছোট ছোট পাড়া। গ্রাম বাংলার রূপের সঙ্গে সাঁঝের বেলার গল্প জমে উঠল। গল্প শুনছিল পাশে থাকা যাত্রীরাও। তাদের মাঝ থেকে ছোট্ট একটি ছেলে আমাদের প্রশ্ন ছুড়ে দিল - 'আপনারা কি নিশাত মজুমদার কে চিনেন?' জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম তার নাম জয়নাল আবেদিন আজাদ। দুরছরি বাজারের জগন্নাথ মন্দিরের পেছনে তার বাড়ি, শহর থেকে অনেক দূরে থাকে সে। এমনই এক অজ পাড়াগাঁয়ের ছেলের মুখে পরিচিত নাম শুনে অবাক হলাম। পাল্টা প্রশ্ন করলাম, 'তুমি কি করে চিন তাকে?' আজাদ বলল, 'পেপারে পড়ছি। এভারেস্ট জয় করেছিল তিনি।' সঙ্গে যোগ করল তার নিজের স্বপ্নের কথাও - বন্ধুদের নিয়ে নিশাত আপুর সঙ্গে এভারেস্ট যাবে সে। পড়ার টেবিলে বসে এমনই কল্পনা তার। আরও কথা হল তার সঙ্গে। বেশ অবাক হলাম। দুরছরিতে নেমে যাওয়ার আগে আজাদের ফোন ও ঠিকানা নিয়ে নিলাম। কখনও যদি সুযোগ হয় তাকে তার স্বপ্নের পথে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব।

সন্ধ্যা নামল। চাঁদের রুপোলি আলো স্নিগ্ধতা ছড়িয়ে তার ভুবন সাজাতে শুরু করলো। আমরা পরিতৃপ্ত মন নিয়ে মাঝি মাল্লার গান গাইতে গাইতে পৌঁছে

গেলাম মারিসশায়। থাকার জায়গা পাবতো!!! লঞ্চের সঙ্গে আগে ভাগেই কথা বলে নিলাম। তারপর নিশ্চিন্ত মন নিয়ে ঠিকানা খুঁজতে বের হলাম। ঘাট থেকে উঠেই একটি বিশাল মাঠ চোখে পড়লো, মাঠকে বামে রেখে কিছু দূরে হাঁটতেই একটা রেস্ট হাউস পেলাম। কেয়ারটেকারের সঙ্গে কথা বলে ঘরও পেয়ে গেলাম। রাতে খাওয়া হল জম্পেশ - আলু ভর্তা, মুরগির ঝাল তরকারি, মরিচ ভর্তার সাথে ভাত। গরম গরম জিলিপি দিয়ে মিষ্টি মুখ করলাম। তবে মনের মিষ্টির যোগান দিল বেগ ভাই। সাজেক কিন্তু' খুব বেশি দূরে নয়। ইচ্ছে হলে কাল ঘুরে আসা যায়!!! অনেক দিন এপথে আসার অনুমতিও ছিলনা। তাই তীরে এসে তরী না ডুবিয়ে একটা জীপ ভাড়া করে ফেললাম। মারিশার থেকে সাজেক ঘুরিয়ে বাঘাইছড়ির পথে ছেড়ে দেবে। সাজেক ভ্রমণের রোমাঞ্চকে সঙ্গে নিয়ে ঘুমের দেশে পাড়ি জমালাম।

সকালের নাস্তা প্যাক করে নিয়ে নিলাম, পথে খেয়ে নেওয়া যাবে। প্রায় সবাই মিলেই গাড়ির ছাদে চড়ে বসলাম। ইঁট বিছানো পাহাড়ি পথ পেরিয়ে ঘন সবুজ বনের ভেতর দিয়ে যেন উড়ে চলেছে আমাদের গাড়ি। খানিকটা এগিয়ে পিচ ঢালা মসৃণ পথ। পাহাড়ের গা ঘেঁষে কখনও ওপরে আবার কখনওবা তীক্ষ্ণ বাঁক ধরে দুরন্ত গতিতে নেমে যাচ্ছে। পিচঢালা পাহাড়ি এই সরু পথের দুধারে বড় বড় ঘাসের বন। এককেটা চার-পাঁচ ফুটের সমান হবে। পথটি তাই অসাধারণ লাগছিল। মাঝে মাঝেই মনে হচ্ছিল পথটা যেন সোজা মিশে গেছে আকাশে। ওখানে গেলেই বুঝি আকাশটা ছোঁয়া যাবে। রাঙ্গামাটি ছেড়ে দুপাশের পাহাড়গুলো খাগড়াছড়িতে প্রবেশ করেছে। এখানে পাহাড়ের উচ্চতাও বেড়ে গেছে অনেকখানি। পাহাড়ের উঁচু থেকে নীচে দেখা যাচ্ছে শত শত ছোট ছোট টিলা। সাজেক ভ্যালি! অনেক নাম শুনেছিলাম। আজ দেখে আমাদের কেউ কেউ একে বাংলাদেশের দার্জিলিং বলে ফেলল। সত্যিই যেন তাই মনে হচ্ছিল। ভাল লাগা - এর জন্যই হয়তো বেঁচে আছি। ছবি তুলছিলাম একের পর এক। আমাদের জীপটা রিজার্ভ করা থাকলেও পথে স্থানীয় মানুষদেরও তুলে নিচ্ছিলাম। তাদের সঙ্গে মিশে যাওয়ার জন্যও। আবার আর্মি ক্যাম্প!!! আমাদের দেশটাকে তখনই ছোট মনে হয় যখন বাধা পাই একটু স্বাধীন ভাবে ঘুরে বেড়াতে। যাই হোক এই ক্যাম্পে আমাদের থামতে হল না। ছুটে চললাম নিজেদের গন্তব্যে।

পথে মাঝে মাঝে ছোট বড় বাজার পড়ল, সেখানে নেমে পানি খেয়ে নিলাম। চলন্ত গাড়িতে বাতাসের বেগ থাকায় সূর্যের তাপ এতক্ষণ টের পাইনি। গাড়ি থেকে নামতেই হাত-মুখ সব জ্বালা করতে লাগল। রোদ থেকে বাঁচতে গামছা জড়িয়ে নিলাম। মাইল ফলক দেখছি একটু পর পর, ধীরে ধীরে চলে এলাম সাজেক। ০ পয়েন্ট থেকে প্রায় ১ কিলোমিটার আগে একটা চার্জ আছে সেখানে নামিয়ে দিল গাড়ি চালক। বলল এখান থেকে হেঁটে যান, ভাল লাগবে। এতক্ষণ দেখার আনন্দে নাস্তা খেতে ভুলেই গিয়েছিলাম। মনে পড়তেই তাড়াতাড়ি সেগুলোর সদ্গতি করলাম।

সাজেক ভ্যালির রূপের কথা আমার কলমে প্রকাশ করা সম্ভব নয়, তারপরও চেষ্টা করছি। অসংখ্য পাহাড়ের গা বেয়ে সাজেকের রিজে চড়ার পিচ ঢালা পথ ০ পয়েন্টের আর্মি ক্যাম্প পর্যন্ত গেছে। প্রায় ১৫০০ ফুট উঁচুতে শেষ হয়েছে এই পথ। রাস্তার দুপাশ খাড়া নীচে নেমে গেছে, ওপর থেকে তাকালে চোখে পড়ছে অগণিত ছোট ছোট পাহাড়ের ভ্যালি। তিনটি হেলিপ্যাড ও আর্মি ক্যাম্প জুড়ে রেখেছে পুরো এলাকাটি। ডান দিকে দেখা যায় বিশাল এক দেওয়াল। মায়ানমারের পাহাড় ওই দেওয়ালটা। সেটাও একটা পাহাড়ের রিজ তবে অনেকটা উঁচু। আর এই দুইয়ের মাঝে অনেক নীচুতে সারি সারি ছোট ছোট পাহাড়।

ফেরার পথে জীপ আমাদের বাঘাইছরি উপজেলার বাঘাইহাটে নামিয়ে দিল। সেখান থেকে দীঘিনালা পর্যন্ত স্থানীয় জীপে চড়ে গেলাম। তারপর ছোট্ট একটি বাসে চেপে খাগড়াছড়ি। আজই ঢাকায় ফিরব তাই প্রথমেই বাসের খোঁজে কাউন্টারে গেলাম। রাত ৯ টায় গাড়ি ছাড়বে। হাতে এখনও পাঁ-ছ'ঘণ্টা সময় আছে। চটপট দুপুরের খাওয়া শেষ করে একটা সি.এন.জি. রিজার্ভ করা হল। শ পাঁচেক টাকা নেবে। বিনিময়ে আমাদের রিয়াংসুই ঝরনা ও আলু টিলা দেখিয়ে নিয়ে আসবে। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লাম। সন্ধ্যা হলে ঝরনার দিকে যাওয়া মুশকিল হবে তাই সেদিকেই আগে চললাম। মূল রাস্তা থেকে ডানদিকে একটা সরু রাস্তায় ঢুকে একটু পরেই নামতে হল। গাড়ি আর যাবেনা, বাকী মিনিট কুড়ির পথ হেঁটে যেতে হবে। কিছুটা পথ কাঁচা রাস্তা হলেও ঝরনার পাশে পাকা সিঁড়ি করা হয়েছে পর্যটকদের সুবিধার্থে। পানির ধারা প্রবল বেগে আছড়ে পড়ছে একটি ঢালু জমিতে। বিশাল সেই ঢালু জায়গাটার ডান কোনা দিয়ে পানির ধারা নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে। কেউ কেউ সেখানে স্লিপও খাচ্ছে দেখতে পেলাম। গরমে শীতল পানির আরাম নিতে আমিও নামার তোড়জোড় করলাম। তখনই খবর পেলাম কেউ একজন পাথরে পা পিছলে পড়ে মাথা ফাটিয়েছে। ভালোই লেগেছে দেখলাম।। ফার্স্ট এইড বক্স সঙ্গে ছিল। প্রাথমিক ভাবে যা করার করে তাকে দ্রুত হাসপাতালে বা ডাক্তারের কাছে যেতে বললাম। হাতে সময় কম থাকায় হাল্কা গা-মাথা ভিজিয়ে ফেরার পথ ধরলাম। পরের গন্তব্য আলু টিলা। অন্ধকার নেমে এসেছে পাহাড়ি জনপদে। লাইট জালিয়ে চলেছে সব গাড়িই।

আলু টিলা। এখনও প্রবেশ দুয়ার খোলা। কোন গার্ড নেই, নেই কোন দর্শনার্থীও। আমাদের দলের সবাই দার্জিলিং গিয়েছি হিমালিয়ান মাউন্টেনিয়ারিং-এর প্রশিক্ষণ নিতে। সেখানকার রাতের দৃশ্য মনে পড়ে গেল। পাহাড়ের ওপর থেকে দেখতে পেলাম খাগড়াছড়ির রাতের রূপ। পাহাড়ি শহর। পাহাড়ের গায়ে গড়ে ওঠা ঘর বাড়ি। সেখানে জোনাকি পোকার মত জ্বলছে বাতিগুলো। অসাধারণ লাগল।

অন্ধকার হয়ে যাওয়ায় বেশিক্ষণ দাঁড়ানো গেলনা, স্থানীয় পুলিশ আমাদের নিজেদের সুরক্ষার খাতিরেই বিদায় নিতে বলল ভদ্রভাবেই।
এবার ফেরার পালা, আকাশের চাঁদ মধ্য গগনে বিরাজ করছে, শহরের দিকে ফিরছি আমরা। চাঁদের সাজ দেখে মনে হল আজ বা কাল পূর্ণিমা। তান্নি জানালো খাগড়াছড়িতে নাকি কোন এক পূর্ণিমাতে হাজার বাতির এক উৎসব হয়। সেদিন তারা হাজার হাজার মোমবাতি জ্বালায়, ফানুস ওড়ায়, প্রার্থনা করে। এটা বৌদ্ধদের খুব বড় একটা উৎসব।
শহরে ফিরে এলাম। ঢুকেই দেখলাম একটা বাড়িতে অনেকগুলো মোম জ্বলছে। উত্তেজনা ছড়িয়ে গেল সবার মধ্যেই। আজই কি তাহলে সেই উৎসব - "আশ্বিন পূর্ণিমা"? বাহ! এরই নাম কপাল। সাড়ে ন'টার এখনও এক ঘণ্টা দেরি আছে। ওদের সঙ্গে চলে গেলাম এক মাঠে। প্রদীপ জ্বালালাম সেই আনন্দ উৎসবে। সুন্দর একটা মনভরানো ভ্রমণের শেষে উৎসবের রেশটুকু মনের মধ্যে বুনে নিয়ে ফেরার পথ ধরলাম।

মহম্মদ মহিউদ্দিন - মাউন্টেনিয়ারিং আর নানান অ্যাডভেঞ্চারের নেশাটা ছেলেবেলা থেকেই। 'এক্সপ্লোর বাংলাদেশ' ট্যুরিজম সংস্থার ট্রাভেল এক্সিকিউটিভ মহি-র স্বপ্ন সাইকেলে সারা বাংলাদেশ ভ্রমণ।

কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.
tell a Friend

তাজমহল - প্রেমে অপ্রেমে

দময়ন্তী দাশগুপ্ত

~ আগ্রার তথ্য ~ আগ্রার আরও ছবি ~

"Did you ever build a castle in the air? Here is one, brought down to earth, and fixed for the wonder of ages; yet so light it seems, so airy, and when seen from a distance, so like a fabric of mist and sunbeams, with its great dome soaring up, a silvery bubble about to burst..." - Bayard Taylor (1855)

প্রথম দর্শনে

প্রবল কুয়াশায় চব্বিশ ঘন্টা লেট করে ট্রেন যখন কনকনে শীতের এক সন্ধ্যায় আগ্রা পৌঁছাল তখন মনে হল এ বড় সঠিক সময় হয়নি। আবার পরদিন সকালে যখন কুয়াশা পেরিয়ে শেষপর্যন্ত তাজ-এর সামনে দাঁড়ালাম তখন মনে হল, কিচ্ছু যায় আসেনা - আমি তো বেঁচে আছি, আর এই জীবনেই দাঁড়িয়ে আছি 'তাজমহল'-এর সামনে। হয়তো রৌদ্র ঝলমলে শ্বেতশুভ্র আলোমাখা তাজ নয়, কিন্তু কুয়াশা এক অদ্ভুত মায়া সৃষ্টি করেছে তাজকে ঘিরে, যে মায়া বুকের ভেতর মোচড় দেয়।
তাজের গেট থেকে অনেকটা হেঁটে এসে কারুকার্য করা লাল বেলেপাথরের বড় ফটকটার সামনে পৌঁছেও তাজ অধরা। প্রতি মুহূর্তেই তাই বুকের মধ্যে স্পন্দন বাড়ে, প্রথম দেখার অপেক্ষায়।...
ফটক পেরিয়ে প্রথম প্ল্যাটফর্ম - প্রথম দর্শনের শিহরণ অথবা মুগ্ধতা...
অনেকক্ষণ চুপ করেই দাঁড়িয়ে থাকি। হয়তো মুগ্ধতাতেই। একশো বছরেরও বেশি আগে হয়তো ঠিক এখানে দাঁড়িয়েই প্রসন্নময়ীর একই অনুভব হয়েছিল - আমি রোমাঞ্চিত হই। (প্রসন্নময়ী - প্রথম বাঙালি মহিলা যিনি ভারতভ্রমণ নিয়ে পুস্তক লেখেন, ১৮৮৮ সাল নাগাদ।)
আমারও তো সেই ছেলেবেলায় ইতিহাসে পড়া তাজ, বড় হয়ে বইয়ে, টিভিতে, ইন্টারনেটে দেখা - যেন বহুপরিচিত আপনজন কেউ। তবু সামনাসামনি প্রথম দেখায় মনের মধ্যে একটা অপূর্ব আবেশের সৃষ্টি হয় যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ব্যক্তি আমিকে যেন বিস্মৃত হই কিছুক্ষণের জন্য।

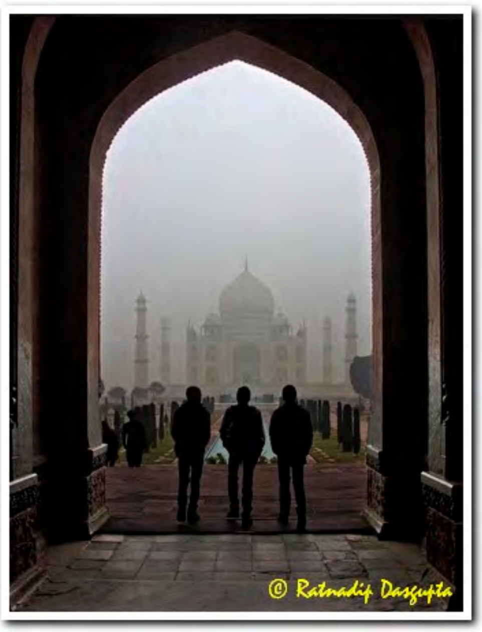

প্রসন্নময়ীর মত সুন্দর করে লেখার ভাষাতো নেই আমার কাছে, তাই অনুভূতিগুলো যখন মিশে যায় একশো বছর আগের এক লেখিকার সঙ্গে তখন সেই অনুভবে ডুবে যেতে যেতে তারই পুনরাবৃত্তি করার ইচ্ছা জাগে। এ যেন প্রথম দর্শনে প্রেমে পড়া, তারপর তাকে একটু একটু করে জানা-চেনা। যতটুকু জানা যায়, চেনা যায় মাত্র দু'দিনের ভ্রমণে। সত্যি কতটুকুইবা। তবুতো ইচ্ছে করে। আর তাই নেমে লাল বেলেপাথরে বাঁধানো রাস্তা ধরে হাঁটতে থাকি সাজানো বাগিচা আর জলাশয়ের গা ছুঁয়ে ছুঁয়ে।
সবুজ বাগান। দুপাশে গাছের সারির মাঝে নীল জলাশয়ে তাজের মুখচ্ছবি - সেই চেনা পিকচার পোস্টকার্ড। শুধু শীত ঠাণ্ডার কুয়াশায় মোড়া চাদরে তাজ যেন বড়ই বিষণ্ণ।
ক্রমশঃ কাছে এগিয়ে আসছে তাজ - বদলে যাচ্ছে পার্সপেক্টিভ। দূর থেকে দেখা সামগ্রিক দ্বিমাত্রিক ফ্রেম ভেঙে এখন আলাদা আলাদা করে দৃশ্যমান বা চোখের আড়াল হচ্ছে একেকটা অংশ। ক্ষুদ্র থেকে বৃহতে উত্তরণ ঘটছে দর্শকের চেতনারও।

"দূরের মানুষ যেন এল আজ কাছে
তিমির আড়ালে নীরবে দাঁড়ায়ে আছে
বুকে দোলে তার বিরহ ব্যথার মালা
গোপন মিলন অমৃত গন্ধ ঢালা..."

বিরহ ব্যথার মালাখানি কী করে গোপন মিলন অমৃত গন্ধ ঢালা হয় এখানে দাঁড়িয়ে তা যেন সত্যিই অনুভব করা যায়...।

দেখা না দেখার পালা

তাজমহলে ঢোকার সময় সিকিউরিটির অসম্ভব চেকিং। আপাদমস্তক বাঙালি আমাদের তিনজনকেই কোন দেশের মানুষ তা বারবার জবাব দিতে হয়েছিল,

তারপরেও সন্দেহের দৃষ্টিতে বডি চেকিং হল। দীপের মন্তব্য বোধহয় আমার দাড়ি আর কালো জ্যাকেট দেখে উগ্রপন্থী ভেবেছে। তাহলে আমাকে? গম্ভীর মুখে গালে হাত বোলাই। নাহ্। লম্বা লাইনে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে সিকিউরিটি চেকিং-এর বিস্তর ঝামেলা পোহানোর পর মস্ত গেট পেরিয়ে ঢোকা। চারটে দিক থেকে তাজমহলে ঢোকা যায়। মাঝের খোলা জায়গাটা পেরিয়ে লাল বেলেপাথরের প্রধান ফটক। ফটক পেরিয়ে সামনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ালে তাজ দেখার প্রথম রোমাঞ্চ অনুভূত হয়। ভিডিও ক্যামেরাতেও এইপর্যন্তই ছবি তোলা যায়।

বিস্তীর্ণ খোলা সবুজ বাগিচার পশ্চাৎপটে শান্ত-স্নিগ্ধ তাজ। কুয়াশার চাদর তাকে ঘিরে রয়েছে আলতো করে। হাঁটতে হাঁটতে মাঝের প্ল্যাটফর্মগুলোয় বসে মুগ্ধ হয়ে দেখি। কুয়াশায় মোড়া শীতের সকালে দর্শনার্থীর সংখ্যাও বেশ কম। টিকিট কাটার সময়েই টিস্যু পেপারের জুতোঢাকা নেওয়া হয়েছিল। সমাধি সৌধের কাছে পৌঁছে জুতোর ওপর দিয়ে পরে নিই। শ্বেতপাথরে বাঁধানো সিঁড়ির ওপর পা রাখতেও রোমাঞ্চ লাগে। উঠে এলাম মূল চত্বরে। এখানে দাঁড়িয়ে একটা অদ্ভুত শান্ত অনুভূতি হয়। সামনে বিশাল জোড়া আর্চ। সাদা মার্বেলে ইনলে করা রঙিন পাথরে ফুল লতাপাতায় পিয়েত্রা দুরা কারুকাজ। যেন হাতির দাঁতের গয়নায় মিনাকারি। সাদা-কালো আর গেরুয়া রঙের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। তবে কারুকার্যে ব্যবহৃত মূল্যবান মণিমুক্তা-পাথর আর কিছুই নেই। নকশার পাড় দেওয়া কোরানের বাণী। নিঁখুত জ্যামিতির কায়দায় ওপর নীচের হরফের আকার চোখে সমান লাগে। মার্বেল কেটে তৈরি জানলায় জাফরির কাজ। মুগ্ধ হই। তাজের দুপাশে মোটামুটি একশো গজ দূরত্বে লাল বেলেপাথরের দুটি ইমারত রয়েছে। ওপরের তিনটি করে গম্বুজ এবং সামনের কারুকার্যে এখানেও সাদা মার্বেল ব্যবহার করা হয়েছে। পশ্চিমেরটি মসজিদ এবং অন্য পাশেরটি জামাত খানা, যেটি মসজিদের সাযুজ্য রাখতে তৈরি করা 'জবাব'।

সৌধের ভেতরে পা রাখি। কুয়াশার অন্ধকার আরও ঘন হয়। আবছা আলোয় দেখা যাচ্ছে সমাধির রেপ্লিকাদুটি। মূল সমাধিদুটি নীচের তলার কোন আঁধার কক্ষে লোকচক্ষুর অন্তরালে রয়েছে। মমতাজের সমাধিটি মাঝখানে। বাঁপাশে অপেক্ষাকৃত বড়টি শাহজাহানের। সিমেট্রি ভেঙ্গে যাওয়াটা চোখে পীড়া দেয়। ইতিহাস বলছে এটা পরে তৈরি। সমাধিদুটিকে ঘিরে অষ্টভুজাকৃতি শ্বেতপাথরের জাফরির বেড়া। হয়তো রোদ থাকলে, গবাক্ষের জালিকার ফাঁক দিয়ে রোদের ছটা এসে সমাধিকে ছুঁয়ে গেলে আরও একটু ভালো লাগত ভেতরটা। কে জানে! কক্ষের দেওয়াল আর সমাধির গায়ে মার্বেলের ওপর ফুল-লতাপাতার মোটিফ। সমাধিদুটিতে ব্যবহৃত মার্বেল এতই উচ্চমানের যে প্রায় স্বচ্ছ বলে মনে হয়। চল্লিশ রকমের দামী পাথর আর মণিমুক্তায় খচিত সমাধির কারুকার্য। মমতাজের সমাধিতে কোরানের বাণী উৎকীর্ণ করা আছে। সিলিং-এ অপরূপ নকশা। সিলিং থেকে কবরের ওপরে ঝোলানো রয়েছে মুঘল স্থাপত্য শৈলীতে তৈরি একটি বাতিদান - লর্ড কার্জনের শ্রদ্ধার্ঘ্য। রুপোর দুটি দরজাও ছিল প্রথমে। জাঠেরা লুট করে নিয়ে যায়। তাজমহলের অন্দরে সব জায়গায় মার্বেল নেই। ভেতরের অন্য কক্ষে সিমেন্টের কারুকাজ।

বাইরে বেরিয়ে আসি। কী যেন একটা অতৃপ্তি রয়ে যায় মনের মধ্যে। যাকে হয়তো বহু বছরেও ঠিক চেনা যায় না তাকে কয়েক ঘন্টায় সত্যি দেখা হয় কি? তারপরতো একবছর কেটে গেছে। লিখতে পারছিলাম না তাজ কাহিনি। আজও লিখতে লিখতে মনে হচ্ছে ওকেতো ভালো করে দেখা হল না, চেনা হল না আদৌ, কী লিখব! বেলা বাড়ছে, একটু একটু করে ভিড় জমছে তাজ চত্বরে। ভিড়ের আঁচ এড়িয়ে তাজের পেছনের বারান্দায় দাঁড়াই, ফটিকচাঁদের দৃশ্য চোখে ভেসে ওঠে। সামনে নীল যমুনা। দূরে একটা নৌকা চোখে পড়ে। ওপাড়ে না হওয়া কালো তাজ-এর কাঠামোর ভগ্নস্তূপ। কুয়াশায় খুব দূরে চোখ যায় না।...

তারপর...

তাজমহলের স্থাপত্য সৌন্দর্যকে অনেকটাই বুঝতে হয় অনুভবে। হয়তো ইতিহাস, গল্পকথা, ভাস্কর্য গড়ে তোলার কাহিনি অথবা ভাস্কর্যের জ্যামিতিক বিন্যাস সবই তখন কাজ করে মাথার মধ্যে।

ইতিহাস অথবা গল্পকথা

হয়তোবা পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য তাজমহল। হিন্দু, পারসিক, ইন্দো-ইসলামিক নানা স্থাপত্যের মেলবন্ধনে তিলোত্তমা সে। তাজমহলের প্রধান আবেদন শাহজাহানের প্রেম কাহিনি। কিন্তু সত্যি ইহজীবনে কতটা সুখ পেয়েছিলেন মমতাজ? তাজমহলের সামনে দাঁড়িয়েও এ প্রশ্ন আমাকে বিচলিত করেছিল। শাহজাহানের তিন স্ত্রীর মধ্যে দ্বিতীয় (হারেমের অন্য মহিলাদের কথা বাদই দিচ্ছি) মমতাজ উনিশ বছরের বিবাহিত জীবনে চৌদ্দটি সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন। এই কি সম্রাটের ভালোবাসা?
মমতাজ ওরফে আর্জুবানু মীর্জা গিয়াস বেগের নাতনি, আসফ আলির কন্যা, নূরজাহানের ভাইঝি। মমতাজ আর শাহজাহানের প্রথম দেখা হয়েছিল জমজমাট বাজারের মধ্যে। মমতাজ বিক্রেতা আর শাহজাহান ক্রেতা। প্রথম দর্শনেই মুগ্ধ যুবরাজ খুররম। আর্জুবানুর কথার চতুরতায় রীতিমত পর্যুদস্তও।

সময়টা ১৬০৭ সাল। আকবরের মৃত্যুর পর সদ্য ক্ষমতায় এসেছেন জাহাঙ্গির। বর্ধমানের জায়গিরদার শের আফগান নিহত হয়েছেন। মেহেরউন্নিসা তখনও জাহাঙ্গিরকে নিকাহ করেননি, অবশ্য রয়েছেন তাঁর হারেমেই। জাহাঙ্গিরের কাছে আর্জুবানুকে বিবাহ করার আবেদন জানালেন খুররম। মেহেরউন্নিসার কাছ থেকে তার আগেই খবর পেয়েছিলেন সম্রাট। রাজি হয়ে গেলেন পুত্রের আবেদনে, কিন্তু এক শর্তে - তার আগে মেহেরউন্নিসাকে নিকা করতে হবে শাহেনশাহকে। মেহেরউন্নিসা মনস্থির করতে পারলেন না। পিছিয়ে গেল খুররম আর আর্জুবানুর মিলনও। ইতিমধ্যে পারস্যের রাজকুমারীকে বিবাহ করলেন খুররম। অবশেষে নূরজাহানের সঙ্গে জাহাঙ্গিরের বিয়ে হল ১৬১১ খ্রিস্টাব্দে। আর তার একবছর পর মমতাজ আর শাহজাহানের।

১৬৩১ সাল। দাক্ষিণাত্য বিজয়ে বেরিয়েছেন শাহজাহান। সঙ্গে রয়েছেন মমতাজ। বুর্হানপুর কেল্লায় জন্ম হল তাঁদের চৌদ্দতম সন্তানের। শাহজাহানের অন্য দুই স্ত্রীর গর্ভের সন্তান সংখ্যাও ততদিনে অনেক। এর আগের তিন সন্তানই মারা গেছে প্রসবের পরই। উনচল্লিশ বসন্ত পার করা মমতাজও তখন খুবই অসুস্থ ও দুর্বল। সন্তান প্রসবের ধকল সইতে পারলেন না আর। মমতাজের মৃত্যুর পর সাতদিন নিজের কক্ষ থেকে বেরোননি শাহজাহান। যেদিন বেরোলেন সবাই বিস্মিত হয়ে দেখল বৃদ্ধ, কুব্জ সম্রাটকে, এই সাত দিনেই অনেক বছর যেন পেরিয়ে গেছে তাঁর জীবনে। পুরো দুবছর সারা হিন্দুস্থানে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল আমোদ-উৎসব। পরিকল্পনা শুরু হয়ে গেল তাজমহলের। আর সেই মেয়েটি, যে জন্মেই হারিয়েছিল তার মাকে, সেই গৌহান-আরা-র খবর কে রাখে?

ভাস্কর অথবা ভাস্কর্যের কাহিনি

তাজ পরিকল্পনা কার এ বিষয়টি আজও তর্কমূলক। কারণ শাহজাহান চেয়েছিলেন তাজের সঙ্গে একমাত্র তাঁর নামটিই উল্লিখিত হোক। তাই লোকগাথা বলে, তাজ সৃষ্টির শেষে প্রধান বাস্তুবিদের দুটো হাত কেটে দেওয়া হয়, অন্ধ করে দেওয়া হয় লিপিকারদের, মুখ্য স্থপতিবিদের তো গর্দানই নেওয়া হয়। যাতে আর দ্বিতীয় তাজ কেউ সৃষ্টি করতে না পারে। একে সত্যি নয়, গল্পকথা বলেই ভাবতে ইচ্ছা করে। কিন্তু যা রটে তার কিছুটাতো বটে।

মমতাজের মৃত্যুর ছমাস পর তাঁর দেহ যখন আগ্রায় নিয়ে আসা হয় ততদিনে সমাধির জায়গা বেছে ফেলেছেন শাহজাহান। যমুনার তীরে, আগ্রা কেল্লা থেকে দেখা যাবে, আবার একেবারে বাজারের লাগোয়া। তাজগঞ্জের ঘিঞ্জি বাজারটা কিন্তু তখনও ছিল। তখন তার নাম ছিল তাসিমাকান। টাভার্নিয়ারের বর্ণনায় পাই, সেই বাজারে হাজির হতেন সারা পৃথিবীর বণিকরা। নিজের শিল্পকীর্তির প্রচারের এর চেয়ে ভালো জায়গা আর কি হতে পারে? বিজ্ঞাপন এবং প্রচারের ব্যাপারটা সে যুগেই সম্রাট শাহজাহান বেশ ভালো বুঝেছিলেন। জায়গাটা মহারাজ মান সিংহের বংশধর রাজা জয়সিংহের দখলদারিতে ছিল। সমমূল্যের খাসজমির বদলে জায়গাটির দখল নিলেন সম্রাট। স্থান নির্বাচন হলে দেশ-বিদেশের স্থপতিদের কাছে নকশা পেশ করার আবেদন রাখা হল। সেরা নকশা দিয়ে তৈরি হবে শাহজাহানের স্বপ্নের সৌধটি। হয়তবা ততদিনে মমতাজ উপলক্ষ মাত্র।

তাজ পরিকল্পনা রূপায়ণে অর্থব্যয়ে কোন কার্পণ্য করেননি শাহজাহান। সব মিলিয়ে সাড়ে আঠেরো কোটি শাহজাহানী টাকা ব্যয় হয়ছিল যা ছিল লাল কেল্লার নির্মাণ ব্যয়ের ঠিক দ্বিগুণ। জয়পুর থেকে এসেছিল সেরা জাতের মার্বেল আর দেশ-বিদেশ থেকে হিরে, মুক্তো, মণি-মানিক্য। দামী পাথরের অঙ্গসজ্জাতেই খরচ হয়েছিল আঠেরো কোটি। এর কিছুই প্রায় আজ আর অবশিষ্ট নেই।

টাভার্নিয়ারের লেখা থেকে জানা যায় কুড়ি হাজার মানুষের বাইশ বছরের পরিশ্রমে তৈরি হয় তাজ। এই বাইশ বছরে তাদের কাছ থেকে হারিয়ে গিয়েছিল ভালোবাসা, প্রেম, সংসার, সন্তান সবকিছুই, হয়তোবা কারোর কারোর গোটা জীবনটাই।

শ্বেতশুভ্র তাজের শরীরে শুধু ভালোবাসা নয়, অনেক দীর্ঘশ্বাস, অশ্রু, রক্ত, ঘামও লেগে রয়েছে। শাহজাহানের সময়ের ঐতিহাসিক মীর মুগল বেগের লেখা থেকে শিল্পী এবং কর্মীরা কে কত মাইনে পেতেন তাও জানা যায়। তিনি উল্লেখ করেছিলেন হাজারো নকশা থেকে শাহজাহান বেছেছিলেন একটিমাত্র নকশা। কিন্তু কে সেই নকশাকার সে বিষয়ে তিনি একেবারেই নীরব। যদিও ১৯৩০ সালে খুঁজে পাওয়া ১৭ শতকের একটি কবিতার পুঁথির পাণ্ডুলিপিতে রচয়িতা লুৎফ আহমেদ জানাচ্ছেন তাঁর পিতা উস্তাদ আহমেদই

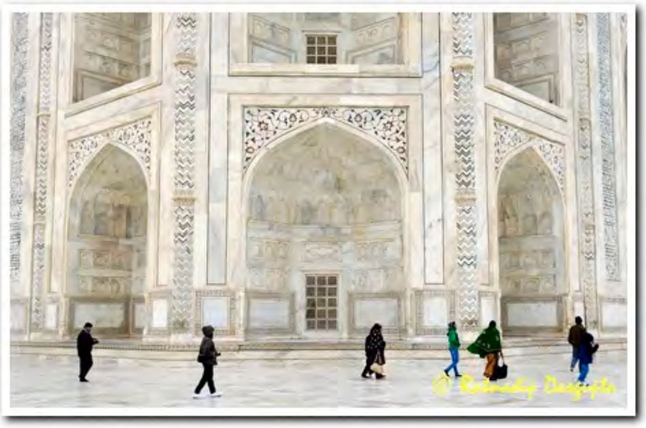

তাজমহল এবং লাল কেল্লার রচয়িতা, সে কথা কতটা বিশ্বাসযোগ্য সে সন্দেহ রয়েই যায়। কারণ স্থাপত্যের দিক থেকে তাজমহল এবং লাল কেল্লা একেবারে আলাদা। উস্তাদ ঈশা আফান্দি বিদেশি ছিলেন, তাঁর প্রকৃত পরিচয় রহস্যাবৃত। হাজরির খাতার প্রতি পৃষ্ঠায় তাঁর নাম রয়েছে সবার ওপরে মূল পরিকল্পনাকার হিসেবে। তাজমহলের পরিকল্পনা তাঁরই ছিল এমনটা বিশ্বাস করেন অনেক গবেষক এবং ঐতিহাসিকও।

তবে পরিকল্পনা যারই হোক না কেন তাঁর কর্মের মধ্যে দিয়েই স্বাক্ষর রেখে গেছেন এই স্থপতি। এখানে শাহজাহানের অন্যান্য কীর্তির চিরাচরিত ভঙ্গিমাগুলি প্রায় বর্জন করা হয়েছে। উপরের চারটি ছোট চবুতরা ছাড়া নয় বাঁকওয়ালা খিলান নেই, ছত্রীবর্জিত সমতল ছাদ নেই। তাজমহলে হিন্দু শৈলীর আশ্চর্য সংমিশ্রণ দেখা যায় পঞ্চরত্ন-দেউল বাস্তু নকশায়, তাঞ্জোরি গম্বুজে, মহা-পদ্ম-ঘন্টা-আমলক-কলসের ব্যবহারে, যা শাহজাহানকৃত অন্যান্য স্থাপত্যে অনুপস্থিত। পার্সপেক্টিভ বা পরিপ্রেক্ষিত জ্ঞান এবং অপটিক্স বা আলোক বিজ্ঞানের প্রয়োগের অসাধারণ উদাহরণ তাজমহল, যা ভারতীয় অন্যান্য স্থাপত্যে এর আগে সেভাবে দেখা যায়না। ফলে এর থেকেও বোঝা যায় যে এই কীর্তি কোন ভারতীয়ের নয়।

তাজমহলের ভূমির পরিকল্পনা পারস্য শৈলীর বৃত্তকেন্দ্রিক। ভূমির একেবারে কেন্দ্রে একটি বৃত্ত, যার মধ্যে রয়েছে সমাধিদুটি। এই বৃত্তের চারদিকে চারটি বৃত্ত। প্রত্যেকটি বৃত্ত মাঝের বৃত্তকে ছুঁয়ে আছে কিন্তু কেউ কাউকে ছেদ করেনি। হিন্দু শৈলীর পঞ্চরত্ন-দেউল মন্দিরেও কিন্তু আমরা এই একই রীতি অনুসরণ করতে দেখি। কাজেই এর কোনটি যে তাজমহলের উৎস তা বলা কঠিন।

তাজমহলের বাগানের ছকটাও সামঞ্জস্যপূর্ণ। বর্গক্ষেত্রাকার জমির ঠিক মাঝখানে একটা বর্গাকার জলাধার। এই জলাধার থেকে পরস্পরের সমকোণে চারদিকে চারটে নালা মূল বাগানকে চারটে সমান ভাগ করেছে। প্রত্যেক ভাগই একটা করে বর্গক্ষেত্র। আবার এই প্রত্যেকটা বর্গক্ষেত্রকে একজোড়া করে পথ সমান চারটে বর্গক্ষেত্রে ভাগ করেছে। মোট ষোলোটা টুকরো জমি। পথের দুপাশে পাইন, পাম, পপলার এমন সব বড় গাছ। আর জমিগুলির ভেতরে নানান ফুলের গাছ।

তাজমহলের স্থাপত্যে যে দুটি জিনিস সবথেকে চোখে পড়ে তা হল গম্বুজ ও মিনার চারটি। আর যা চোখে পড়ে না অথচ যার ওপরে ভিত্তি করে পুরোটাই দাঁড়িয়ে আছে তা হল তাজমহলের ভূমি নকশা। যার সামগ্রিক মূল্যায়ন করা সহজ হত যমুনার ওপারে কৃষ্ণ তাজটি গড়ে উঠলে। তবেই কাঠামোটি সম্পূর্ণ হত। খুব সম্ভব গম্বুজের পরিকল্পনা করেছিলেন উস্তাদ আহমেদ। যার জন্য তাঁর পুত্র পিতাকে পুরো তাজেরই পরিকল্পনাকার বলে ধরে নিয়েছিলেন। যদিও সেই পরিকল্পনাও আদ্যন্ত তাঁর নিজের কল্পনাপ্রসূত নয়, তাঞ্জোর দেউলের গম্বুজের প্রায় হুবহু নকল। শুধু গম্বুজের শীর্ষে থাকা ত্রিশূল বদলে গিয়ে ঈদের চাঁদ হয়েছে। তাজের মিনারগুলির বৈশিষ্ট্য হল পরিকল্পনা করেই প্রত্যেকটিকে সিমেট্রিকালি বাইরের দিকে হেলিয়ে রাখা হয়েছে। যাতে কোনদিন যদি কোনটি ভেঙ্গেও পড়ে তাহলেও মূল স্থাপত্যের কোন ক্ষতি হবে না।

অন্যদিকে শাহজাহানের সমসাময়িক ভ্রমণকারী টাভার্নিয়ার, যিনি তাজমহল নির্মাণের সূচনা ও শেষ দেখেছেন বলে দাবি করেন এবং তাজমহল নির্মাণের পাঁচ বছর পর তা দেখার অভিজ্ঞতা থেকে ভ্রমণকারী বার্নিয়ার রোমের সেন্ট পিটার্স-এর আদলে তৈরি ভাল-দে-গ্রেস-এর গম্বুজের সঙ্গে তাজের তুলনা করেছেন। অর্থাৎ এখানেও ইউরোপীয় না ভারতীয় কোন বৈশিষ্ট্য এর উৎস ছিল সে বিষয়ে সংশয় রয়েই যায়।

অপটিক্স বিজ্ঞানের প্রয়োগকৌশল সামগ্রিকভাবে পুরো তাজমহলেই রয়েছে, তবে তার সর্ব্বোত্তম ব্যবহার হয়েছে তুঘরা হরফে কোরাণ-শরিফের বাণীর ক্যালিগ্রাফিক লেখনীতে। প্রয়োগকৌশলে ওপরে-নীচে সর্বত্র লেখার হরফ সমান মাপের দেখায়। তাজমহলের আগে ভারতীয় স্থাপত্যে এর ব্যবহার তেমন দেখা যায় না। ইউরোপে রেনেসাঁর সময়ে এই trompe l'oeil বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন ভাস্কর্যে ব্যবহার হতে দেখা গেছে। এর লিপিকার ছিলেন আমানৎ খান শিরাজী, যিনি গম্বুজের অনেক ওপরে খুব ক্ষুদ্র অক্ষরে সাহসভরে নিজের নাম লিখে গেছেন। যে সাহস বা সুযোগ মূল স্থপতির হয়নি।

তবে তার সামগ্রিক সৌন্দর্যেই যে তাজ তিলোত্তমা তা স্বীকার করেছেন সকলেই।

আবার ভ্রমণে

... তারপর বারবার ফিরে আসি। সকালবেলার তীব্র কুয়াশার চাদর সরিয়ে জেগে ওঠা তাজমহল ঠিক যেন মানুষের কোন সৃষ্টির মত নয় ("a house not made with hands")। দুপুরের নরম রোদ তার ত্বকে তারুণ্য এনে দেয়। সন্ধ্যার আলো-আঁধারে মনখারাপের মতই রহস্যময়ী সে। জ্যোৎস্নারাতে ঘন কুয়াশায় ঢেকে যখন সমস্ত দর্শনার্থীর হৃদয়ে দীর্ঘশ্বাস জমে ওঠে তখনই একঝলক তার হালকা অবয়ব ধরা দেয় ক্যামেরার ফ্রেমে।

"তুমি নব নব রূপে এস প্রাণে...।"

ইতমৎ-উদ-দৌলা, জামা মসজিদ দেখে অটো থেকে নেমে হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে যাই যমুনার ওপারে, তাজমহলের পেছনে। মেহতাব বাগের ভেতর দিয়ে

রাস্তাটা এসে পড়ে যেখানে কৃষ্ণ তাজের পরিকল্পনা করেছিলেন শাহজাহান। তারই ভিতের ভাঙ্গা ইঁটপাথরের ওপর বসে তাজকে দেখি যেখান থেকে দেখতে চেয়েছিলেন শাহজাহান মরণের পরে। সামনেই ক্ষীণকায়া যমুনা। শীতে তার জল কমে গেছে। দুপুরের হালকা রোদ্দুরে খানিক উজ্জ্বল আর মোহময় হয়ে উঠেছে তাজ। টুসি হয়তোবা একটু আবেগদীপ্তই হয়ে পড়েছিল কিম্বা মজা করেই বলল বীরেন যদি কথা দেয় এমন একটা বানাবে তাহলে ও এক্ষুনি মরতে রাজি আছে। বললাম, তাজমহল নিয়ে তুই করবিটা কী, তখনতো দেখতেও আসবিনা, তার চেয়ে বেঁচে থাকা অনেক ভালো। পরে পড়তে গিয়ে দেখি একথা অনেকেই এমনকী প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের স্ত্রীও তাঁর স্বামীকে নাকি টুসির মত এই কথাই বলেছিলেন। বোঝ!
আগ্রার কেল্লাও ঘুরে এসেছি ইতিমধ্যে। বন্দী শাহজাহান যে কক্ষ থেকে তাজমহল দেখতেন সেই কক্ষে এখন প্রবেশ নিষিদ্ধ। তার পাশের বারান্দায় দাঁড়িয়ে বহু চেষ্টা করেও কুয়াশা ভেদ করে তাজ দেখা যায়নি। কেন জানি মনে হল অনেক বছর আগে বৃদ্ধ শাহজাহান এখানে বসে এমন কোন দিনে হয়তোবা এরকমই কুয়াশার দিকে নিস্ফল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন। মমতাজের প্রয়াণের পর আরও পঁয়ত্রিশ বছর বেঁচে ছিলেন শাহজাহান যার মধ্যে শেষ আটবছর ছিলেন পুত্রের হাতে বন্দী। ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুর পর ঔরঙ্গজেবের নির্দেশে শাহজাহানের দেহ তাজমহলে মমতাজের সমাধির পাশে কবরস্থ করা হয়।
আবারও তাজমহলের কাছে ফিরে আসি। দূর থেকে, কাছ থেকে দেখি। নরম রোদ্দুরের আঁচল জড়িয়ে কুয়াশার ঘুম ভাঙা তাজকে আরও সুন্দর লাগে। হিন্দু-পারসিক-ইসলামিক, রোমের সেন্ট পিটার্স কিম্বা দাক্ষিণাত্যের মন্দির - শেষপর্যন্ত কোন তুলনারই প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।
"তোমার তুলনা আমি খুঁজি না কখনো বহু ব্যবহার করা কোন উপমায়"

একটু রোদ্দুর উঠতেই তাজে দর্শনার্থীদের ঢল নেমেছে। ফটক পেরিয়ে প্রথম প্ল্যাটফর্ম থেকেই থিকথিকে ভিড়। নানা সংস্কৃতির ভারতীয়, বিদেশি মুখ - ব্যাকগ্রাউন্ডে তাজ না থাকলে মনে হত অন্য কোন দেশেই আছি যেন। বাগানের দৈর্ঘ্যের মাঝখানে আরও দুটো প্ল্যাটফর্ম আছে যেখান থেকে দাঁড়িয়ে বা বসে তাজ দেখা যায়। সর্বত্র ক্যামেরা, মোবাইল হাতে উৎসাহী জনতা - তাজমহলের সঙ্গে একটি নয়, অনেক মূহুর্ত। কেউবা একা, যুগলে অথবা সপরিবারে। কেউ হাতের আঙুলে তুলছেন তাজ, অত্যুৎসাহীরা শূন্যে ঝাঁপ দিচ্ছেন তাজকে ব্যাকগ্রাউন্ডে রেখে। আমরাও ক্যামেরাবন্দী করি কিছু স্মৃতির টুকরো।
ভিড়ের ঠেলায় দ্বিতীয়দিন আর সমাধিকক্ষের ভেতরে ঢোকার সুযোগ ঘটেনা। লম্বা লাইন এঁকেবেঁকে চলে গেছে নীচ থেকে ভেতর পর্যন্ত। ঘুরে বেড়াই নীচের চত্তরেই। বাগানে হাঁটতে হাঁটতে নানান দিক থেকে তাজকে দেখি ছোট বড় গাছের ফাঁক দিয়ে। ফুলগুলো বাতাসে মাথা দোলায়। খানিক বিশ্রাম নিতে জুতো খুলে বসে পড়ি মসজিদের মেঝেতে। সূর্য অস্ত যায় তাজের পশ্চাৎপটে। ধোঁয়া ধোঁয়া মনকেমনের আঁধার নেমে আসে।
বাইরে বেরিয়ে এসে ছোট একটা দোকানে বসে অনেকটা চিনি দেওয়া পনেরো টাকার এক গ্লাস চা খাই। নানা আকারের নানা জিনিসের তাজের ভাণ্ডার নিয়ে পসরা সাজিয়ে বসেছে দোকানীরা। ছোট ছোট তাজমহল কিনে নিই চেনাপরিচিতদের উপহার দেওয়ার জন্য।
তাজমহলের দক্ষিণে খুব কাছেই তাজগঞ্জের জমজমাট বাজার। এখানে নানা মানের আর দামের অজস্র হোটেল আছে। প্রায় সবারই আকর্ষণ রুফটপ রেস্টুরেন্টে তাজ ভিউ - খেতে খেতে তাজ দেখা যাবে। এই বাজার নাকি শাহজাহানের সময়েও ছিল, আর সেই জন্যই এখানে তাজমহলের তৈরির পরিকল্পনা হয়েছিল যাতে ভিনদেশি বণিকের মুখে-মুখে দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ে তাজের কাহিনি। পুবদিকে উত্তরপ্রদেশ পর্যটনের হোটেল তাজ খেমা। এদিকেই আরও বেশ কিছুটা এগিয়ে আমাদের ঠিকানা।

জ্যোৎস্না রাতের তাজ দেখতে পাব কী পাব না একটা দোটানা মনের মধ্যে ছিলই। তাও সকালে টিকিট কেটে রেখে রাত্তিরে নির্দিষ্ট সময়ে একদফা চেকিং শেষে চেপে বসেছিলাম পর্যটনের বাসে। রাতের তাজমহল দর্শনার্থীদের তো কলম ম্যয় হোটেল ঘরের চাবি পর্যন্ত জমা রেখে যেতে হবে এমনই নিয়মের কড়াকড়ি। তখন রাত দশটা বেজে গেছে। নিঝুম হয়ে গেছে গোটা শহর। তাজের বাইরেও অন্ধকারে সব থমথম করছে। শুধু বেশ কয়েকটা বাস বোঝাই দর্শনার্থী আর সিকিউরিটি তাজের দোরগোড়ায়। মোটামুটি আধঘন্টার একেকটা দলের জন্য বরাদ্দ। আগের দলটা বেরিয়ে এলে আমাদের ঢোকার পালা। আমরা কৌতুহলী হয়ে জানতে চাই, দেখতে পেলেন? রহস্যময় মুখে কেউ কেউ উত্তর দেন, দেখুননা ভিতরে গিয়ে। রাতের দর্শনে প্রথম প্ল্যাটফর্ম পর্যন্তই যাওয়া যাবে। কুয়াশা সরিয়ে বড় থালার মত লাল রঙের চাঁদ উঠেছে। দেখে আশা হয়। যেকোনো সময় মুগ্ধ হতে পারি এমন একটা অনুভবের উত্তেজনা মাথার মধ্যে কাজ করে। নাহ। সাদা কুয়াশারা প্রাণপনে জড়িয়ে রেখেছে তাজকে। যেন নিরেট পাথরের সাদা দেওয়াল। চাঁদের আলো আর কুয়াশার ধোঁয়ায় কেমন অপার্থিব হয়ে উঠেছে চারপাশ। মাঝে মাঝে দূরের সার দেওয়া গাছ আরও কয়েকটা দেখা যায়, পরমূহুর্তেই কুয়াশা এসে ঢেকে দেয়। হঠাৎ যেন একঝলক তাকে দেখতে পাই মনে হয়। পর মূহুর্তেই আবার ঢেকে যায়। ওই আলোতেই ছবি তোলা হয়। ছবির ফ্রেমে তাকিয়ে দেখি পেছনে আবছা অবয়বে যেন ধরা দিয়েছে সুন্দরী।

শেষপর্যন্ত

রোদ ঝলমলে তাজ দেখা হল না। নীল আকাশের পশ্চাৎপটে, শুভ্র জ্যোৎস্নায় অথবা যমুনার নীল জলের প্রতিচ্ছবিতে দেখা হল না এই শ্রেষ্ঠ সুন্দরীকে। মনের মধ্যে একটা আফশোস রয়েই গেল। শেষবেলায় মায়াবী তাজের চোখে চোখ রেখে স্তব্ধ হয়ে যাই। কই শেষপর্যন্ত প্রসন্নময়ীর মত বলতে পারি নাতো যে শাহজাহান তাজ না বানিয়ে সেই অর্থে কোন পতিতাশ্রম, পান্থশালা কিম্বা স্কুল-কলেজ নির্মাণ করলেই ভালো করতেন। আসলে তাজ নেই একথাটা ভাবতেই বুকের মধ্যে অনেকটা যেন ফাঁকা হয়ে যায়। তাজ - সে কি শুধুই শাহজাহানের নাকি আমাদের সবারই, আমরা যারা তাকে দেখে কোন না কোন একবার মুগ্ধ হয়েছি প্রথম প্রেমের মত। তাজের সামনে দাঁড়িয়ে ভালোবাসা, না ভালোবাসার টানাপোড়েনে দ্বিখণ্ডিত হতে হতে মনে হয় আর কি কোনদিনও আসব এ জীবনে? শেষপর্যন্ত তবে ভালোবাসারই জয় হল কি - নিজেকেই প্রশ্ন করি।

নাহলে, যাবার বেলায় এত পিছুডাকে কেন?

কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ
নারায়ণ সান্যাল - লা জবাব দেহলী অপরূপা আগ্রা
প্রসন্নময়ী দেবী - আর্য্যাবর্ত্তে বঙ্গমহিলা, নব্যভারত, ভাদ্র ১২৯৪
Francois Bernier - Travels in the Mogul Empire (A.D.1656-1663) [Translated and Annoted by Archibald Constable (1891)] 2nd Edition
Ganesh Saili - Taj Mahal (Golden India)

~ আগ্রার তথ্য ~ আগ্রার আরও ছবি ~

'আমাদের ছুটি' -র প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক দময়ন্তী দাশগুপ্ত, বর্তমানে অন্য কোন নামী বা অনামী পত্র-পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত নন। চাকরি বা ব্যবসা কোনটাই তাঁর দ্বারা সম্ভব হয়নি, গৃহকর্মনিপুণাও নন। ছোটগল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, ভ্রমণ কাহিনি লেখার পর এখন নিজের আনন্দে মেতে আছেন গবেষণায়। প্রাণীবিজ্ঞানের স্নাতক এবং ইংরেজি সাহিত্যের স্নাতোকোত্তর হবার পর বাংলায় ভ্রমণ সাহিত্যের চর্চা করছেন। এরপরে কী করবেন তা নিজেও জানেন না। তাঁর কথায় নিজের পরিচয় 'ঘরেও নাহি পারেও নাহি যে জন আছে মাঝখানে'। ২০১৫ সালের কলকাতা বইমেলায় 'পরশপাথর' প্রকাশনা থেকে তাঁর সংকলিত এবং সম্পাদিত 'অবলা বসুর ভ্রমণকথা' বইটি প্রকাশিত হচ্ছে।

কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu

দেবতাদের রাজ্যে দুর্যোগে

দেবাশিস বসু

কিন্নরের তথ্য ~ কিন্নরের আরও ছবি ~ লাহুল-স্পিতির আরও ছবি

সুন্দর ঝকঝকে সকাল। চারদিকে সাদা বরফ শরীরে মেখে হিমালয় পর্বতশ্রেণী, যেন, স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব বিরাজমান। নীচে দীর্ঘ ঝাউয়ের সারি - মহাদেবের ভক্তদল। আরও নীচে ছড়ানো ছিটানো আপেল গাছ, যেন, শিশুরা খেলা করছে। দক্ষিণ-পূর্বে ৬০৫০ মিটার উঁচু বিখ্যাত কিন্নর কৈলাস শিখর দৃশ্যমান। সূর্য সরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যার রঙ বদলে বদলে যাচ্ছে। শহরের কোলাহল থেকে দূরে, স্নিগ্ধ প্রশান্ত পরিবেশ।
১২ জুন, ২০১৩। গত পরশু কালকা মেলে সিমলা এসে পৌঁছেছি। সেখান থেকে গতকাল কল্পায়। আমাদের এবারের হিমাচল ভ্রমণ পর্ব শুরুতেই একটু ধাক্কা খেয়েছে। সিমলা পৌঁছে জানতে পারি কুনজুম-লা (গিরিপথ) বন্ধ। তাই আমাদের বেড়ানোর পথটা একটু অদল-বদল করে নিতে হয়েছে। ট্যুর অপারেটরের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির হল সিমলা থেকে, কল্পা-নাকো-টাবো-কাজা-কিব্বের হয়ে, সাংলা বা রামপুর ফিরে এসে, কুলু-মানালি-কেলং-উদয়পুর-ত্রিলোকিনাথ ঘুরে আবার কালকায় ফিরে কালকা মেল ধরব। এবারে আমরা দলে এক মহিলা সহ মোট সাতজন।

কল্পা থেকে কাজার পথে দুর্গা মন্দির

ভ্রমণের শুরুতেই কিন্নর-লাহুল-স্পিতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত তথ্য দিয়ে নিই - শুনেছি হিমাচলের এই কিন্নর দেশকে বলা হয়, ধরাধামে ইন্দ্রকানন আর কিন্নরবাসীদের দেবতাদের উত্তরপুরুষ। এখানকার নারী-পুরুষদের গায়ের রঙ ফরসা, সুন্দর মুখশ্রী। মহিলা-পুরুষ নির্বিশেষে কুর্তা-পায়জামা ধরণের পোষাক সঙ্গে গরম কোট জাতীয় কিছু এবং মাথায় কিন্নরী টুপি পরেন। ইতিহাস বলে, এঁরা মঙ্গোলীয়, খ্রীষ্ট জন্মেরও সহস্র বছর আগে এখানে আসেন। সমাজজীবন গড়ে উঠেছে হিন্দু ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির মিলনে। সহজ সরল অতিথিপরায়ণ। সঙ্গীত ও নৃত্য এঁদের অতি প্রিয়। শতদ্রু ও স্পিতি দুই মুখ্য নদী, এছাড়াও অন্যান্য ছোট নদী এবং সাংলা-রূপা-লিংটি-পিন ইত্যাদি উপত্যকা নিয়ে কিন্নরদেশ। এখানকার পাহাড়শ্রেণীর মধ্যে শিবালিক, জাঁসকর প্রভৃতি প্রধান হলেও মুখ্য আকর্ষণ কিন্নর-কৈলাস। লাহুল ও স্পিতির বিশেষ খ্যাতি তার নৈসর্গিক শোভা - বরফ আচ্ছাদিত পর্বতশ্রেণী, গ্লেসিয়ার, লেক, সুদৃশ্য উপত্যকা ও গুম্ফা বা মনাস্ট্রির জন্য। সূর্যের কিরণ যেমন প্রখর, বাতাসও তেমনই কনকনে।
কল্পার থেকে পায়ে পায়ে পৌঁছলাম রোঘি গ্রামে। আশপাশে আপেল গাছের সারি, এখন সবে আপেল ধরেছে। গ্রামে তিব্বতীয় শৈলীতে তৈরি একটি মন্দির ছাড়া অল্পসংখ্যক স্থানীয় মানুষের বাসস্থান রয়েছে। এর আগে যখন সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে এসেছিলাম, তখন, সবুজ পাতার থেকেও বেশি লালচে খয়েরি রঙের বা কোথাও কোথাও হাল্কা সবুজে সাদায় মেশানো টসটসে আপেলে গাছগুলো ভর্তি ছিল। সে এক মনোহর দৃশ্য। ঘুরে নিলাম ৯৫০ থেকে ১০৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তৈরি হু-বু-লান-কার গুম্ফা আর চিনি বাংলো গুম্ফা। কোন একসময় কল্পার নাম ছিল 'চিনি'।
পরদিন ১৩ জুন সকালে কল্পা থেকে বেরিয়ে নাকো পৌঁছলাম। উইলো ও পপলারে ঘেরা ছোট্ট সুন্দর লেককে ঘিরে এই গ্রাম। নৈসর্গিক শোভা নয়নাভিরাম। লেকের উত্তরে চারটি বৌদ্ধ মন্দির আছে, যার বিগ্রহ ও ম্যুরাল চিত্র অনবদ্য। প্রাচীন এক গুম্ফাও আছে এখানে। নাকোতে ঘন্টাখানেক থেকে ৬৩ কিলোমিটার দূরে টাবোর দিকে রওনা দিলাম। স্পিতি নদীর পাড়ে এই গ্রাম। গ্রামে প্রায় শ'চারেক লোকের বাস। মূল আকর্ষণ ৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে তৈরি বৌদ্ধ গুম্ফাটিতে তিব্বতীয় শৈলীতে তৈরি। চমৎকার ফ্রেস্কো, স্টাকো শৈলীর মূর্তি ও বর্ণময় ছবির সম্ভার দেখে মুগ্ধ হতে হয়। একে হিমালয়ের 'অজন্তা'-ও বলা হয়। তিব্বতের 'থোলিং' আর 'হেমিস' গুম্ফার পরেই এর স্থান। রয়েছে ইউনেস্কোর হেরিটেজ সম্মানও। দেওয়ালে বুদ্ধের জীবনকথা তথা জাতক কাহিনি আঁকা। দশ শতাব্দী ধরে গড়ে ওঠা মাটির প্রাচীরে ঘেরা ৬৩০০ বর্গ মিটার ব্যাপী ছড়িয়ে থাকা এই মনাস্ট্রিতে রয়েছে ৯ টি মন্দির, ২৩টি চোর্তেন বা স্তূপ, ৩০টি থাঙ্কা ও সহস্র মুদ্রায় বুদ্ধের মৃন্ময় মূর্তি। আর আছে পালি ও ভোট ভাষার নানা পুঁথি, প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র প্রভৃতি। গুম্ফার চত্বরে মঠ, বিহার, অ্যাসেম্বলি হল ও দুটি বিদ্যালয়ও আছে। মূল গর্ভগৃহে বুদ্ধের জ্যোতির্ময় ধ্যানমগ্ন বিশালাকার সুন্দর মূর্তি। শেষ বিকেলে টাবো থেকে বেরিয়ে সন্ধ্যা নাগাদ কাজা পৌঁছলাম। স্পিতি নদীর ধারে সাব-ডিভিসনাল শহর কাজা। অতুলনীয় নৈসর্গিক শোভা। ওল্ড কাজায় পুরোনো বসতি, নিউ কাজায় সরকারি অফিস, বাস স্ট্যান্ড, বাজার, হোটেল ইত্যাদি।
১৪ জুন সকালে কাজা থেকে বেরিয়ে ৮ কিলোমিটার দূরে কিব্বের গ্রামে পৌঁছলাম। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্যও খুব সুন্দর। জানা গেল, গ্রামের পরে ১,৪০০ বর্গ কিমি ব্যাপী যে স্যাংচুয়ারিটি আছে সেখানে নীল গাই এবং একটি বিশেষ প্রজাতির হরিণ আইবেক্স দেখতে পাওয়া যায়। এখান থেকে ১০ কিমি দূরে গেট্টে গ্রাম, ৪২৭০ মি উচ্চতায়, বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু বসতি। কিব্বের থেকে বেশ কয়েকটি হাই অল্টিচুড ট্রেকিং রুট রয়েছে।
কিব্বের থেকে বেরিয়ে ১২ কিমি দূরে ক্যাসলরূপী কি গুম্ফায় পৌঁছলাম। স্পিতি নদীর বাঁ পাড়ে, ৪১১৬ মি উচ্চতায় অবস্থিত। পঞ্চদশ শতাব্দীর আগেকার এই গুম্ফাটি বিভিন্ন সময়ে টুকরো টুকরোভাবে তৈরি হয়েছিল। যার জন্য ঘরগুলো সব বিচিত্র আঁকা-বাঁকা গলি দিয়ে জোড়া। এখানে বহু দুর্লভ থাঙ্কা চিত্র, অতীতের অনেক বাদ্যযন্ত্র, বহু পুরোনো পুঁথি ইত্যাদি সুরক্ষিত আছে। একজন অল্পবয়সী লামা আমাদের লিকার চা খাওয়ালেন। গর্ভগৃহ খুলে খুব সুন্দর, শান্ত সমাহিত বুদ্ধ মূর্তি দেখালেন।
রাতে আবার কল্পায় ফিরে এলাম।

১৫ জুন সকালে কল্পা থেকে বেরিয়ে পথে স্পিলো গ্রামে লাঞ্চ সেরে বিকেল নাগাদ সাংলা পৌঁছলাম। দূরত্ব ৫১ কিমি হলেও রাস্তা খারাপ থাকায় এই দেরি। সন্ধে থেকেই লাগাতার হালকা বৃষ্টি চলল।
১৬ জুন সকালের দিকে আকাশ একটু পরিষ্কার হলেও একটু বেলায় সেই যে বৃষ্টি শুরু হল তার আর থামার নাম নেই, চলল সারা দিন-রাত। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় রাস্তায় ধ্বস নামার খবর আসতে লাগল।
১৭ জুন সকাল থেকেই ঝকঝকে নীল আকাশ। অল্পস্বল্প মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। বরফ পড়ে পাহাড়ের কালো অংশ সব ঢাকা পড়ে গিয়ে শ্বেতশুভ্র তুষারমণ্ডিত হিমালয়। কিন্তু এদিকে বিদ্যুৎ, বি এস এন এল মোবাইলের সিগনাল কিছুই নেই। একটু বেলা হতেই আবার বৃষ্টি চলল রাত দশটা পর্যন্ত। আমাদের চোখের সামনেই হোটেলের কাছের পাহাড় খানিকটা ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ল। তবে বৃষ্টির মধ্যেই চলল ধ্বসের পর রাস্তা মেরামতির কাজ। আমাদেরও আশঙ্কা বাড়তে লাগল।
১৮ জুন সকালে বৃষ্টি থেমে আকাশ ঝকঝকে হলেও চা জুটল না। বাজার থেকে চিনি উধাও। ক্রমশ খবর পেলাম

নাকো গুম্ফা

মুরগির ডিম, তরিতরকারি আর মোমবাতিও পাওয়া যাচ্ছেনা। দুপুরে খাওয়া ভাত, ডাল, আলুভাতে। বিকেল থেকে আবার রাত দশটা অবধি টানা বৃষ্টি।
১৯ জুন সকালে আকাশ অনেকটা পরিষ্কার কিন্তু আমাদের মন ভার। ২২ তারিখে ফেরার ট্রেন কীকরে ধরব বুঝতে পারছি না। না ধরতে পারলে নতুন করে রিজার্ভেশন কীকরে পাব কে জানে! ঈশ্বরকে স্মরণ করছি, তিনিই যা করার করবেন। তবু অস্থির হয়ে যাচ্ছি। এদিন আমাদের দলের একজনের জন্মদিন ছিল। তাই কিছুটা সময় একটু আনন্দ করে দুশ্চিন্তা ভুলে থাকার চেষ্টা করা গেল।
২০ জুন সকাল আটটার পর থেকে দু'তিনবার হেলিকপ্টারের আসা-যাওয়া দেখে, আমাদের মনেও আশার আলো দেখা দিল। খোঁজ নিয়ে জানলাম, এই এলাকার তহশিলদার অফিসে হেলিকপ্টারে যারা যাবে তাদের নামের তালিকা তৈরি হচ্ছে। ওখানে গিয়ে জানা গেল সব হোটেল থেকেই বোর্ডারদের নামের তালিকা পাঠানো হচ্ছে। হেলিকপ্টারে করে নিরাপদে পাঠানোর তালিকায় প্রথমে অসুস্থ ব্যক্তিরা, তারপরে ভোটের কাজে যেসব রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা এসেছেন তাঁরা, এরপরে বিদেশি পর্যটকেরা এবং সবশেষে

কিব্বের গ্রাম

ভারতীয় পর্যটক আর স্থানীয় লোকজনের পালা। কে বা কারা কবে যাবেন, তার খবর হোটেলের ম্যানেজার জানিয়ে দেবেন।
২১ জুন সকাল থেকে প্রকৃতি শান্ত, সুন্দর। পাহাড়ে বরফ গলে অল্পস্বল্প কালো পাথর দেখা যাচ্ছে। শুধু প্রহরবিহীন প্রতীক্ষা। সকালে দু-তিনবার হেলিকপ্টার দেখা গেলেও পরে তা অদৃশ্য হয়ে গেল। জানা গেল রামপুরে মেঘ জমেছে। মেঘ জমে আমাদের মনেও। ভোডাফোনের সিগনালও নেই।
২২জুন। আজও সুন্দর ঝকঝকে সকাল। সাংলা উপত্যকার সৌন্দর্যের এত খ্যাতি কেন, তা বুঝতে পারছি। তবে মনের অবস্থা যা, কোন দৃশ্যই আর মনে ছাপ ফেলছেনা। আজকের তালিকায় আমাদের নাম না থাকলেও একবার হেলিপ্যাড থেকে ঘুরে এলাম। গত দু'দিন ধরেই অনেক পর্যটক পরিবার হেলিপ্যাডে গিয়ে সারাদিন অপেক্ষা করছেন যদি কোন সুযোগ এসে যায়। শুনলাম স্থানীয় স্টেট ব্যাঙ্কের কর্মীরা এই দুদিন ধরেই হেলিপ্যাডে জমায়েত সবাইকে জলখাবার, চা, ফ্রুট জুস, দুপুরে খিচুড়ি-ডিমভাজা খাইয়েছেন। তাঁদের এই নিঃস্বার্থ সহানুভূতি আর সেবা মন ভরে দিল।
২৩ জুন, সুন্দর সকাল। বেলা এগারটায় সুখবর এল – বিকেল চারটের সময় আমাদের পালা হেলিকপ্টারে। অনেক আগেই হেলিপ্যাডে পৌঁছে গেলাম। মিলিটারি হেলিকপ্টার আমাদের নিয়ে সাংলা ছাড়ল বিকেল ৪.৫২ য়। রামপুর পৌঁছলাম ৫.৩৩-এ। আক্ষরিক অর্থেই আমরা 'উদ্ধার' হলাম। ট্যুর অপারেটরের ব্যবস্থায় সিমলা পৌঁছলাম রাত এগারটা নাগাদ। আঃ কী শান্তি।

সাংলার হোটেল থেকে হিমালয়ের দৃশ্য

২৪ জুন। মাথায় এখন একটাই চিন্তা – ফেরার টিকিটের। ট্যুর অপারেটরই ব্যবস্থা করে ফেললেন ২৫ তারিখের কালকা মেল। তৎকালে সাতটা টিকিট পাওয়া গেছে স্লিপার ক্লাসে। মনমেজাজ প্রায় স্বাভাবিক হওয়ায় কয়েকজন মার্কেটিং-ও সেরে ফেললেন।
২৫ জুন। সারাদিন বেশ হাল্কা মেজাজে ঘোরাঘুরির পর দুপুর সাড়ে তিনটে নাগাদ বেরিয়ে কালকা পৌঁছলাম প্রায় সন্ধ্যে সাতটার সময়। ট্রেন রাত ১১.৫৫।
২৬ জুন। এসি থ্রি টায়ারের বদলে স্লিপার ক্লাস। সর্বত্র থিক থিক করছে মানুষ। তাও বাড়ি ফেরার এই যাত্রাটা যেন এবার একটু বেশিই আনন্দের মনে হচ্ছে।
২৮ জুন। হোম সুইট হোম।

উদ্ধারপর্ব - সাংলাতে

কিন্নরের শোভা - কিব্বের গ্রাম থেকে দেখা

কিন্নরের তথ্য ~ কিন্নরের আরও ছবি ~ লাহুল-স্পিতির আরও ছবি

রেলের চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার দীর্ঘদিন পরও উনআশি বছরের তরুণ দেবাশিস বোসের একটা বড় সময় কাটে ভ্রমণেই।

কেমন লাগল : - select -

মত দিয়েছেন :

গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

কাজিরাঙা জঙ্গল ক্যাম্পে তিনদিন

শ্রাবণী দাশগুপ্ত

~ কাজিরাঙ্গার তথ্য ~ কাজিরাঙ্গার আরও ছবি ~

(১)

গুয়াহাটি থেকে কাজিরাঙা। প্রায় সাত ঘন্টার সফর। লম্বা পথ, চওড়া নিরেট হাইওয়ে। কোথাও কোথাও অবশ্য বড় বাহনের ভিড়। মেঘালয়ের কিছু জায়গা পেরোতে হল। শিলঙের পথে বাঁক নিয়েছে যে রাস্তা, তাতে নাকি খুব যানজট হয়, ড্রাইভার বললেন। গাড়িতে অসমিয়া গানের সিডি বাজছিল। ঝিমুনি আসছিল সহজে, মাদকতা-মাখানো সুরের নেশায়। দূরে দূরে বাড়ি, বিস্তীর্ণ মাঠঘাট। আমাদের যাত্রা অবশেষে গন্তব্যে। কাজিরাঙা গ্রামে ঢুকে পড়েছি। চোখের সামনে কাজিরাঙা ন্যাশন্যাল পার্ক-এর হোর্ডিং, দিকনির্দেশ, আরও কিছু আবশ্যিক সূচনা।
যেখানে উঠব, সেটি গুয়াহাটির নামজাদা পেশাদার হোটেলেরই ব্যবস্থাপনা। গাড়ি চলছিল যে চওড়া পাকা রাস্তা ধরে, তার পাশে গ্রাম উঁকি মারে, মৃদু জঙ্গল, জলাভূমি। হঠাৎ কী সৌভাগ্য! দুটো গণ্ডার, বনের ভেতর থেকে কী কারণে বেরিয়ে, প্রায় পথের ওপরেই জল খাচ্ছে নিশ্চিন্তে। আরেকটু এগিয়ে ডানদিকে বাঁশের খুঁটিতে বাঁধা হোর্ডিং-এ 'কাজিরাঙা জঙ্গল ক্যাম্প'। কাঁচা পথ। ধুলো উড়িয়ে বেঁকেচুরে ঢুকে পড়ল গাড়িটা। বেলা প্রায় দেড়টা, তেলতেলে রোদে ভাসা দুপুর। ডিসেম্বর মাস। অথচ, গায়ের গরম জামাগুলো অবাঞ্ছিত বোঝার মত বিরক্তিকর হয়ে উঠেছে। এখানে শীত পড়ে না নাকি?
গাড়ি যেখানে নামাল, সেই চারপাশটা থমকে দিল একেবারে। আপাদমস্তক! এরকমটা ভাবি নি, মাথাতেই আসে নি। ইন্টারনেট খুলে ছবি দেখেছিলাম, তবু...। কী অসম্ভব অন্যরকম। গুয়াহাটির হোটেলটির একটা এক্সটেনশন, বলেছিলেন ওঁরা। তবে পরীক্ষামূলক সূচনা। আমাদের অসুবিধে হতে পারে। ভবিষ্যতে বৃহত্তর পরিকল্পনা আছে। সে থাক। তবে আমাদের ভাগ্যে যেটুকু, সেটুকু পরের পর্যটকদের থাকবে না! অসাধারণ অনুভূতি! আপাতত ভণিতা বাদ। চারপাশ খোলা বিস্তৃত মাঠে এসে দাঁড়াল গাড়িটা। একদিকে 'কাজিরাঙা কলেজ'। লম্বাটে একতলা, বাঁশের বেড়া, খানিকটা পাকা। বন্ধ, ছুটি চলছিল। মাঠের মাঝখানে মস্ত আটচালার মত। মাথায় পাতার ছাউনি। বাঁশের খুঁটি। দুদিক ঘিরে গোটাদশেক ছোট্ট কটেজ, মানে, আক্ষরিক অর্থেই কুটীর। বাঁশের খুঁটি। ছ্যাঁচা-বেড়ার দেওয়ালে মাটি লেপা, সাদা চুনকাম। ছাদ বাঁশ আর ত্রিপল দিয়ে। খুব শ্রীপূর্ণ। পেছনে ভীড় করে আছে মস্ত মস্ত গাছ। সামনে বেড়া দিয়ে ঘেরা ছোট্ট জায়গা। 'পঞ্চবটী বনে সেই গোদাবরী তীরে', শৈশবে শোনা গানের কলি কেন মনে পড়ে! আহা বেশ। এমন যদি বরাবর থাকতে পেতাম! ভোজনালয় সেই মস্ত আটচালা! প্লাস্টিকের টেবিল চেয়ার। সিমেন্টের মেঝে। গরমাগরম দুপুরের আহার।

বাউণ্ডারি ওয়ালের বালাই নেই। ছোট নীচু প্রাকৃতিক বাউণ্ডারি ডিঙোতেই ওধারে আহা হা... যতদূর চোখ ছড়াই চা বাগান। ঘন সবুজ চুপ করে আছে মাইলের পর মাইল। সিঁথির মত সরু মাটির পথ ধরে হাঁটি আমরা। কেউ কোত্থাও নেই। খানিকটা দূরে, সম্ভবত পাকা রাস্তার ধার ঘেঁষে বাংলোবাড়ির আভাস পাওয়া যাচ্ছিল। অফিস হতে পারে, বা কোয়ার্টার্স। বেশি দূর এগোই না আর। শহুরে মানুষ, সবেতেই নিরাপত্তাহীনতার ভয় পাই। যদিও রিসর্টের কর্মীরা অভয় দিয়েছেন, এমন কী বন্য পশুরাও এখানে এসে বিরক্ত করে না। চেয়ার পেতে নীরবে বসে থাকি ঘরের সামনে। নিবিড় নির্জন চারিপাশ। পায়ের পাতায় মাটি লাগে। এখানে কোথাও বাঁধানো কিছু চোখে পড়ে না। ঘরের ভেতরে বাঁশের চৌকি, আলনা, আরশি। মেঝে অবশ্য সিমেন্টের। কখন যেন সন্ধ্যে নামে। সূর্যের শেষ রশ্মিটুকু মুছে যায়। লাইট জ্বলে ওঠে। ভারী হয়ে অন্ধকার থমথম করে, ভয় ভয় রোমাঞ্চ। একপাশে লম্বাটে রান্নাবাড়ি, কর্মচারীদের বাসস্থানও বটে। দেখি, ওঁরা ব্যস্ত ভোজনালয়ের সামনে। বড় গাছের গুঁড়ি নিয়ে কী যেন...। গোল করে চেয়ার বিছিয়ে আমাদের ডাকেন। ততক্ষণে এসেছেন আরও কয়েকজন পর্যটক, কোত্থেকে যেন ফিরেছেন। আমরা গিয়ে বসি। মস্ত গর্তে গাছের মোটা গুঁড়িতে আগুন, ক্যাম্প ফায়ার। আগুন পোহাই। শীত মালুম হচ্ছে হাড়ে হাড়ে। বাকীরা সকালে গিয়েছিলেন জঙ্গলে। তার বিবরণ শুনি বসে বসে। গল্প জমে ক্ষীর। কটা গণ্ডার দেখা দিল, কিম্বা হস্তীপরিবার, বন্য বরা,

পাখপাখালি। কেউ বললেন, বাঘের আঁচড় দেখে এসেছেন গাছের গায়ে। কাদের হাতির পাল পথ অবরোধে ধেয়ে এসেছিল। শুনি সব, জমা করি। আমরা যাব পরদিন সকালে। রাতের আহার একসঙ্গে। বৈচিত্রের খামতি যত্ন আর আন্তরিকতায় ভরে থাকে। ভোজনকক্ষই কমনরুম। এককোণে ক্যারাম-বোর্ড। খেলা চলে খানিকটা। আবছায়াতে ব্যাডমিন্টন খেলেন দু'একজনা।

(২)

কুঁড়ে ঘরে শুয়ে সারারাত কেঁপেছি। সোয়েটার পরে, লেপ মুড়ি দিয়ে। দিনের বেলার শৌখিন রোম্যান্টিকতা উধাও। কী মারাত্মক ঠাণ্ডা! মনকে প্রবোধ দিই, এদেশের কত গরীব মানুষের মাথার ওপরে ছাউনিটুকুও থাকে না। জানা গেল স্নান করার গরম জল পাওয়া যায়, তবে সময় নির্দিষ্ট। গিজার নেই। জল গরম করার অভিনব পদ্ধতি দেখে মজা লাগল। মাটিতে বিছানো জল সরবরাহের ধাতব পাইপ-লাইন কাঠকুটো জ্বালিয়ে গরম করা হচ্ছে। যতক্ষণ আগুণ জ্বলে, ততক্ষণ গরম। স্নান সারা হল। সকালের চা-কফি। ধড়াচূড়ো পরে আমরা সুসজ্জিত। জঙ্গল দেখতে এতো সরঞ্জাম না লাগাই শ্রেয়, তবু সানগ্লাস, বাইনোকুলার, ক্যামেরা। আজকাল চোখে দেখার চেয়ে ঠুলিতে দেখায় বেশি ভরসা করি। গাড়ি তার গন্তব্যে এসে আমাদের নামাল। ওখান থেকে হাতির পিঠে সওয়ার হয়ে গণ্ডার দেখতে যাব, আর হরিণ। এই অভিজ্ঞতা মনে হয় আছে অনেকেরই, আমাদের সেবার প্রথম।

গাঢ় বেগুনি রঙের ভোর। দু'পাশ থেকে দেখা যাচ্ছে দহ, জঙ্গলকে ঘিরে রেখেছে। গা যে শিরশির করছে, তা শুধু শীতে নয়। একখানা উঁচু বাঁশের মাচা। নীচে হাতির পিঠে ওঠার সারি বেঁধে অপেক্ষা। প্রত্যেক হাতিতে মাহুত ছাড়া আর আটজন। উঠলাম। সত্যিকারের গজেন্দ্রগমন এবারে, খুব লম্বা ঘন ঘাসের ভেতর দিয়ে। উলুখাগড়া বনের মতো, নাম - এলিফ্যান্ট গ্র্যাস্। হাতি লুকিয়ে থাকলেও খুঁজে পাওয়া যায় না সহজে। নির্দেশানুযায়ী মুখ বন্ধ রেখেছি, চরম উত্তেজনা দমন করে। সক্কাল সক্কাল নাকি গণ্ডার আর বন্য হরিণের পাল দর্শনার্থীদের কৃপা করেন। এই অভিজ্ঞতার কোনও উপমা নেই। স্বপ্নের মতো ভোরে আদিগন্ত সবুজ-সোনালি মেশানো জড়ানো ঘাস। দৃষ্টি হারিয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে কোথায় ওদের দেখা পাই? মাহুতের হাতে শক্তপোক্ত লাঠি। হাতিবাবাজীর পিঠে দরকার মতো দু'চার ঘা...। আসলে, ওঁরা নাড়িনক্ষত্র জানেন। বারবার আমাদের সাবধান করছেন নড়াচড়া না করতে। কাঠ হয়ে আছি, নীচে ঘাসের ভেতরে পড়ে গেলে কী হতে পারে, ভাবার সাহসটুকুও পাচ্ছি না। হাতের লাঠি দিয়ে কোথাও কোথাও ঘাসের বন ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছেন, 'এই দেখুন, এই!' বিস্ময়ে শ্বাসরোধ করে দেখছি - জায়গায় জায়গায় বসে বা দাঁড়িয়ে আছে তারা, একা বা অনেকে একসঙ্গে। কোথাও শক্তিমান একশৃঙ্গ গম্ভীর গণ্ডার দুনিয়াকে অগ্রাহ্য করে, কোথাও ভীরু চঞ্চল পলায়নোন্মুখ হরিণ! এভাবে থেমে থেমে, এক কিলোমিটার পরিধি হস্তীপৃষ্ঠে আমাদের পরিব্রাজন। রাজকীয় প্রকৃতির সেকী অপার ঐশ্বর্য! অথচ, দেখার আগেই একগুচ্ছ ক্যামেরার ক্লিক্ ক্লিক্, যদি পালিয়ে যায়! পালায় না ওরা, লুকিয়ে থাকে। জানে, মানুষের মত আদেখলা, হ্যাংলা, নিষ্ঠুর, লোভী প্রাণী জগতে নেই। ফিরে আসছিলাম। ওদিকটায় বড় ও প্রবীন গাছের জঙ্গল। মোটা মোটা দোদুল লতা হঠাৎ সাপ বলে ভুল হয়ে যায়। অবশ্য, শীতে তাঁরা ঘুমোতে গেছেন, জানালেন মাহুত। বর্ষায় রঙবেরঙে ঝুলে থাকেন গাছে গাছে। মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকি, কল্পনায় সবটা দেখতে চেষ্টা করি। কোথাও কোথাও দুর্ভেদ্য ডালপালার জটিল নকশা। গাছের গায়ে জড়ানো মাকড়সার হিজিবিজি জাল। পাখিদের আমি চিনি না। বড্ড যেন ছটফটে। তারাও এগাছ ওগাছ করে। আমাদের জঙ্গল দেখার প্রথম ভাগের ইতি হয়। গেটের কাছে ফিরে আসি।

এবারে গাড়ি নিয়ে যায় আমাদের পার্কের অন্য একপ্রান্তের প্রবেশ দরজায়। এখানে হাতির পিঠ নয়, খোলা জিপে জঙ্গলের আরও খানিক গভীরে যাওয়া। জঙ্গলে ঢোকার আগে বোধহয় মনে রাখা ভাল, জঙ্গল চিড়িয়াখানা বা খাঁচাবন্দী পরাধীন জন্তুদের অনাথ-আশ্রম নয়। জঙ্গল মহলে ওরা শাহেনশা। অতএব আপনার বা আমার ইচ্ছেমত, নিরীহ ভদ্রভাবে সামনে এসে দাঁড়াবে, এটা দুরাশা। অনধিকার চর্চাও! সে যাই হোক, আমাদের জিপ জঙ্গলে প্রবেশ করতে থাকে। (অবশ্যই তত গভীরে যেতে পারে না, যেখানে বনবাসিন্দাদের খাস তালুক।)

জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে চলেছি। কিছুক্ষণ পিচের সরু পথ ছিল, পেরিয়ে গিয়ে কাঁচা রাস্তা। সার সার জিপে উদগ্রীব মানুষ। ছায়ামাখা মসৃণ বনপথ। কোথাও আবার ভীষণ এবড়ো-খেবড়ো। জায়গায় জায়গায় জল জমে আছে। হঠাৎ হঠাৎ গাড়ি প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে ওঠে। কেউ ভয় পান, কেউ যেন কোনও সাজানো পার্কের ফান-রাইডে চেপেছেন... তেমন উত্তেজনায় চেঁচিয়ে ওঠেন। জিপচালক বলেন, 'চুপ, চুপ। ওই দেখুন দূরে...!' দেখি, মা আর বাচ্চা হাতি। আমরা ঘাড় উঁচু করি, ক্যামেরা তাক করি... ওই যে! আর একদল এসে দাঁড়িয়েছে প্রায় পথের ওপরে। একটা দুটো তিনটে... গুণতে থাকি সবাই! ওহো, কী দারুণ! ফিরে গিয়ে বলতে হবে না, ক'জনকে দেখতে পেয়েছি? জিপ এগোয় ধীর গতিতে, কোথাও কিছু বাদ না পড়ে যায়। এক জায়গায় বুনো মোষের খুলি, কঙ্কাল। কাছাকাছি একটা গাছ। জিপ চালক চিনিয়ে দেন বাঘের আঁচড়, গাছের গুঁড়ির গায়ে। সন্দিহান হই। একটু দূরে মাটিতে মস্ত থাবার দাগ। দেখে হিম হয়ে যাই, অথচ পুরোটা বিশ্বাস হয় না। রাতের দিকে নাকি এখানে ঘোরাফেরা করে রাজাসাহেবরা।

আমাদের চলার পথের একপাশে অন্তহীন উদার মাঠ। বাইনোকুলারের সাহায্যে দেখা যায় বুনো মোষ আর বরা। অন্যদিকে গাঢ় বনানী আর দীর্ঘ দহ ঘিরে আছে। জলে সবজে রঙের আভাস। পাড় ধরে ঘন গাছেরা মিলেমিশে অন্ধকার। অপার বিস্ময়! একী! অদূরে সেই দহে, চোখের সামনে শুঁড় দিয়ে জল ছিটিয়ে রাজসিক অবগাহন করছে একলা এক বিরাট হাতি। সার্থক আমার এই আসা! লক্ষ বছরের প্রাপ্তি। পারিপার্শ্বিক ভুলে, আমি তখন দক্ষিণারঞ্জন-বর্ণিত রূপকথার দেশে! আমার চোখ আর বন্যপ্রাণী খোঁজে না... আমি সমস্ত অন্তর থেকে অনুভব করি বন্যেরা বনে সুন্দর। তাদের এই অনাবিল যাপন, এই নন্দিত পরিবেশ, খোলা আকাশ, সবুজের গায়ে সবুজ লেগে থাকা রহস্যময়তা, আমাকে বিমূঢ় করে রাখে। যা চোখে দেখি, তা দেখি। বাকিটা গোপন কল্পনায়। আরও অনেক গভীরে কী আছে, ভেবে গা ছমছম। ভাবি, রাত্তিরে এখানে এলে কেমন লাগে? দূরে দূরে ওয়াচ টাওয়ার বানানো আছে, নীচে জলপানের ব্যবস্থা। টঙে চড়ে বাইনোকুলার চোখে লাগিয়ে দেখছেন অনেকেই... অদূরে অসংখ্য হরিণ, হাতি, বরা, বুনো মোষ, পাখি। মন চায় না আমার। চোখ ভরে আছে নীলে, সবুজে, সোনালিতে, ধূসর ধুলোয়। সন্ধ্যের একটু আগে ফিরে যাই ক্যাম্পে।

দিন শেষ হয়ে এলে, এখানে আর কিছু করার থাকে না। ভয়ানক ঠাণ্ডা। জঙ্গল দেখা হয়ে গেছে। আরও একটা দিন এখানে কী করে কাটবে, ভেবে পান না অনেকে। আমার স্বামী-কন্যাও একটু খুঁতখুঁত করেন। অথচ, বড্ড ভালো লাগায় আমি বিভোর হয়ে থাকি। এই চা-বাগিচা, নিরিবিলি কাঁচা পথ, অবারিত প্রকৃতি দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বলে, ভালো থাক্। সন্ধ্যেবেলায় ঝিমঝিমে অন্ধকার মেখে আগুণ সেঁকা... ভারতের নানান প্রান্ত থেকে আসা ভ্রমণার্থীদের সঙ্গে গল্প। সঙ্গতে কাঠ ফাটার ক্রমাগত আওয়াজ। পরদিন সারা সকালটা ঘুরে বেড়াই এদিক থেকে ওদিক, পায়ে হেঁটে। রোদের তাত প্রচণ্ড। গাছের ছায়ায় বসে পড়ি, দোল খাই। যেমন ইচ্ছে, তেমন করি। বড় রাস্তার ওপরে গিয়ে দাঁড়াই, যদি আবার কপালগুণে কোনও...! কিচ্ছু না। রাস্তা দিয়ে সাঁই সাঁই ছুটে যায় গাড়ি, ট্রাক - ঘন ঘন নয় অবশ্য। বড় রাস্তার ওপাশে বসতি আছে। দেখা যায় গ্রামের মানুষজন।
দুপুর পেরিয়ে বিকেল হলে, ঢুকে পড়ি গ্রামের মধ্যে। ছোট ছোট একতলা, পাকা নয়। খামারের মত জায়গা। পোষা গরু, শুয়োর, হাঁস। বাড়ির মানুষদের সাথে আলাপ করার চেষ্টা করি। এঁরা ভাঙা ভাঙা বাংলা বোঝেন, একটু একটু হিন্দি। অসমিয়া মন দিয়ে শুনলে, আমরা বুঝতে পারি। সংযোগে অসুবিধে হয় না। দেখি গোবর জমিয়ে গ্যাস বানানোর চৌবাচ্চা। তা থেকে দু'একটা লাইট জ্বলে। নিজেরাই নিজেদের মতো করে নিয়েছেন। সরকারি অনুদানও আছে। যাতায়াত করার জন্যে সাইকেল। ঘুরে ঘুরে দেখি। কী জানি কেন মনে হয়, কোথায় যেন দেখেছি! হয়তো স্বপ্নে কিংবা কল্পনায়।

ঝুপ করে সন্ধ্যে নামে, হাড়ে কাঁপুনি ধরে। আগুন জ্বালা হয় যথারীতি। আমরা সেদিন অনুরোধ করেছি, রাতের খাবারে বিশেষ কোনও আঞ্চলিক পদ বানানোর। ওঁরা সানন্দে যোগাড়যন্ত্র করে রেখেছেন। ব্যাম্বু চিকেন আর বিশেষ কী এক চালের ভাত। আমরা সাগ্রহে দেখি বানানোর পদ্ধতি। নুন-তেল, পেঁয়াজ-রসুন, লেবু-লঙ্কা দিয়ে ম্যারিনেট করা চিকেন ভরে দিয়েছেন কাঁচা বাঁশের খোদলে। তার মুখ বন্ধ করা এ্যালুমিনিয়ম ফয়েলে। চাল ধুয়ে জল আর সামান্য ঘি দিয়ে ওভাবেই। যেখানে বসে আগুন পোহাই আমরা সকলে, ওখানে আগুনে ঝলসানো হচ্ছে মুখ-বন্ধ বাঁশের নলচেগুলো। বিচিত্র সমস্ত আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, শুঁশুঁ-বুঁবুঁ, ফটাস-ফট্... কাঠ ফাটার শব্দ। মাথার ওপরে কালো কিংখাবের ঢাকনা, তারার চুমকি। মস্ত ছাউনি-দেওয়া খাবার ঘরটায়, খাওয়ার টেবিলে আকাঙ্ক্ষিত খাদ্য পরিবেশিত হল... স্বাদের তুলনা নেই। আড়ম্বর নেই, আন্তরিকতায় মাখামাখি।
পরদিন সকালে ফিরে যাওয়া। মন কেমন করে। যা দেখতে এসেছিলাম, তার অনেক বেশি পেয়েছি। মনে হচ্ছে, 'এমনি করে যায় যদি দিন, যাক্ না'। তাও কি হয়? ঠাণ্ডা লেগে খানিক জ্বর এসেছে আমার। আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে বের হই। ঘড়িতে সকাল হয়েছে, অথচ সূর্য উধাও। এমন মোটা কুয়াশার চাদর? মেঘ নেমে এসেছে না কি? কটেজের সামনের ঘেরা জায়গাটিতে হাতের নাগালে দাঁড়ানো লম্বা গাছটি অবধি দেখা যাচ্ছে না। খাওয়ার ঘরটিকে অতি সামান্য আভাস অনুভবে বোঝা যাচ্ছে। ছবি তুলি...। কী আশ্চর্য, কী বিস্ময়। এমন হয় কী করে! অবশ্য জায়গাটা সমতলে হলেও, মেঘালয় তো এরাজ্যেই। এমন যাদুকরী কাণ্ডকারখানা অস্বাভাবিক নয় মোটে। ভাবতে ভাবতে, হাতে গরম চায়ের কাপ, আর প্রাতরাশও সেরে নিই। খানিক পরেই বেরোব, বাহন প্রস্তুত। হঠাৎ দেখি, কুয়াশার পাড় ধরে উঁকিঝুঁকি মারছে সূর্য।

বিদায় কাজিরাঙা, গুড বাই, অলভিদা!

~ কাজিরাঙ্গার তথ্য ~ কাজিরাঙ্গার আরও ছবি ~

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রী শ্রাবণী দাশগুপ্ত বর্তমানে স্বামীর কর্মসূত্রে রাঁচিতে থাকেন। কিছুদিন স্কুলে চাকরির পর বাড়িতে থিতু হয়ে এখন লেখালেখিই আর বই পড়াই ভাললাগার বিষয়। বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিন এবং ই-ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছে ছোট গল্প। পাহাড় আর জঙ্গল খুব প্রিয়। বেড়াতে ভালোবাসলেও ভ্রমণ কাহিনি লেখায় হাত পাকানো অল্পদিন।

কেমন লাগল : - select -

মত দিয়েছেন :

গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

ভিন্ন স্বাদের ইতালি

শ্রাবণী ব্যানার্জি

~ ইতালির আরও ছবি ~

বন্ধুরা যখন জিজ্ঞাসা করেন কোন দেশটা তোমার সবথেকে ভাল লাগে, ইতালির নামটাই সবার আগে মুখ থেকে বেরিয়ে আসে। প্রকৃতি প্রেমিক থেকে ইতিহাসপ্রেমী কেউই এদেশে এসে নিরাশ হবেন না। আগে যতবারই ইতালি গেছি, ততবারই ঐতিহাসিক জায়গাগুলির পেছনে ছুটে বেড়িয়েছি আর সেগুলি বেশিরভাগই পড়েছে বড় বড় শহরের আওতায়, যেমন ভেনিস, ফ্লোরেন্স, রোম, নেপলস ইত্যাদি। আজ যে ভিন্ন স্বাদের ইতালির কথা লিখতে চলেছি, তা টুরিষ্টবর্জিত নয়, কিন্তু এখানে অন্যধরণের মানুষজনের আনাগোনা। এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর, ফুলে ফলে ঢাকা জায়গাগুলি, ইতালি তথা ইউরোপের উচ্চবিত্তদের ছুটি কাটানোর জায়গা। এখানে রাস্তায় হকারদের হাঁকডাক নেই, ঠেলাঠেলি নেই, নোংরা গ্রাফিতি নেই, ট্যুরগাইডদের ঝাণ্ডা হাতে এগিয়ে যাওয়া নেই, এমনকি পকেটমারও নেই। এ যেন এক অনাবিল আনন্দে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে গা ভাসিয়ে দেওয়া। আমাদের প্রথম গন্তব্য ছিল লেক কোমো। মিলান শহর থেকে মাত্র ঘন্টা খানেকের পথ। অদূরে তুষারাবৃত পর্বতমালা ও কাচের মতো স্বচ্ছ নীল হ্রদের ধারে ছোট ছোট ফুলে ঢাকা গ্রামগুলিকে যেন একটা পিকচার পোষ্টকার্ড। লিয়েরনা ভিলেজে যে বাড়িটি ভাড়া করেছিলাম, তার সামনের প্রায় পুরোটাই কাচ দিয়ে ঢাকা, যাতে ঘরে বসেই সবাই লেক ও পাহাড়ের সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারে। ভিলার মালিক মার্কো ও সোফিয়া দুজনেই খুব আদরযত্ন করে আমাদের ভেতরে নিয়ে গেল। এত অল্প বয়সে এই দামি জায়গায় কী করে এরা এই ভিলাটি করেছে সেটা ভেবে একটু অবাকই লাগছিল। মার্কো জানাল তার দাদু মারা যাবার আগে আদরের নাতিকে এই বাড়িটা লিখে দেন। সেদিন থেকে চাকরি ছেড়ে ভিলা ভাড়া দিয়ে ঘরে বসেই দিব্যি মোটা টাকা রোজগার করছে!

বেলাজিও

লেক কোমোর ধারে সবথেকে নামকরা ভিলেজ হল "বেলাজিও", যাকে নাকি নকল করে আমেরিকার লাসভেগাসে বেলাজিও তৈরি হয়। এখানে হলিউডের জর্জ ক্লুনি, ম্যাডোনা, ভারসাচি ও সিলভেস্তার স্তালোনের বাড়ি আছে। তারকাদের দর্শন না মিললেও পরের দিন যখন ফেরি নিয়ে জায়গাটিতে পৌঁছলাম তখন প্রথম দর্শনেই ভাল লেগে গেল। এতটাই নিখুঁত সুন্দর করে সাজানো যে রাস্তার ধারে বড় বড় টবে রংবেরং-এর ফুলগুলির মধ্যে কোথাও শুকনো ঝরা ফুলও চোখে পড়ল না। লক্ষ্য করলাম কয়েকজন টব থেকে শুকনো ফুলগুলো তুলে হাতে ঝোলানো প্লাষ্টিকের ব্যাগে ফেলছেন। পাথরের রাস্তার দুধারে সারি সারি বাড়ির বারান্দাগুলি ফুলে ফুলে ঢাকা আর তাদের তলায় তলায় দোকান। দোকানে জিনিসের দাম দেখে অবশ্য চোখ প্রায় কপালে উঠে গেল। হীরে, মুক্তো, চোখ ধাঁধাঁনো অস্ট্রিয়ান ক্রিস্টালের ঝাড়লন্ঠন থেকে গুচি ফেন্ডির ব্যাগ - সবারই আকাশছোঁয়া দাম। এইসব বড়লোকের তল্লাটে হকাররা নকল গুচির ব্যাগ নিয়ে রাস্তা সরগরম করে না - যা বিক্রি হয় সবই একেবারে ষোলআনা খাঁটি! একটি রোলেক্সের হাত ঘড়ির দাম লেখা আছে ষাট হাজার ইউরো। একটি সাদামাটা টিশার্ট সত্তর ইউরো, আর তার পাশে রাখা ব্লুজিনসটির দাম দুশো ইউরো। হীরে-পান্নার দাম আর দ্যুতি দুই-ই এখানে সমান তালে চলে। কেউ কোন অংশে খাটো নয়। বুঝলাম এদেরকে দোকানের বাইরে থেকে দেখাই বাঞ্ছনীয়। তবুও কথাতেই আছে 'স্বভাব যায় না মলে' তাই একসময় আর থাকতে না পেরে একাই হনহনিয়ে একটা ক্রিস্টালের দোকানে ঢুকে গেলাম এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পাশ থেকে একজন প্রশ্ন করল "এনি পারচেজো মিস?" কনফিডেন্টলি উত্তর দিলাম "নো পারচেজো, নো পারচেজো, ল্যুকিংও, ত্যু এক্সপেনসিভো"। লোকটা হাঁ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে খুব সম্ভবত আমাকে ছিটগ্রস্ত বা নেশাগ্রস্ত কিংবা দুটোই মনে করে বলল "নো প্রবলেমো মিস, নো প্রবলেমো"।

জনান্তিকে জানিয়ে রাখি ইতালিতে পা দেবার সাথে সাথেই 'অনুস্বরং দিলেং পরেং সংস্কৃত হয়েং' এর মতো আমিও লাগুক না লাগুক প্রায় প্রতিটি ইংরাজী শব্দের পেছনে 'ও' কার যোগ করে এবং 'ট' কে 'ত' বলে দিব্যি কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলাম। লোকজনকে পাকড়ে মার্কেতো যাবার ডিরেকশানো নিয়ে ভালোভালো সুস্বাদু খাবার কিনে আনতাম। হাতের লটবহরগুলিকে স্টেশনে ডিপোজিটো করে সঠিক ডেসটিনেশানোর টিকিট কেটে ট্রেনে চেপে পড়তাম। ট্রেনের গতির ওপর নির্ভর করে কেউ র‍্যাপিতো কেউ এক্সপ্রেসো আর সোজাসুজি গেলে তারা হন ডিরেকতো। প্রতিবার তিকিতটাকে ভ্যালিডেতো করে না নিলে সে তিকিত হয়ে যাবে ইনকম্‌প্লিতো। সেই অবস্থায় তিকিত চেকারের হাতে পড়লে খুবই মুশকিলো এবং প্রচুর টাকা খেসারৎ দিয়ে তবেই সেটা হবে পারফেক্‌তো।

সে যাই হোক কোমো লেকের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ খেয়াল করলাম অনেকটা দূরে একটা ভিলার সামনে একটা হাইড্রো প্লেন একেবারে সটাং আকাশ থেকে দিব্যি জলে নেমে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই লমবারগিনির মতো দামি গাড়ি দেখতেও চোখ বেশ অভ্যস্ত হয়ে পড়ল। লেকে দেখলাম বড় বড় রাজহাঁস ঘুরে বেড়াচ্ছে। এক কথায় জায়গাটিকে অসম্ভব সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। লেক থেকে পাহাড়ের দিকে ধাপে ধাপে সিঁড়ি উঠে গেছে, আর তার দুধারে বাড়ি। এখানকার লোকজনের চেহারাও খুব ছিপছিপে কারণ প্রতিদিন অতগুলি সিঁড়ি ওঠানামা করলে কোন জিমে গিয়ে আলাদা করে স্টেয়ার মাস্টার করার দরকার হয় না। লোকজনের চালচলন, দামি সাজপোষাক, ফুলে ফুলে ঢাকা রাস্তাঘাট, দামি দামি গাড়ি আর দোকানে দোকানে জিনিসের বাহার দেখলে এই বেলাজিও যে একটি অভিজাত বড়লোকদের বাসস্থান সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহই থাকে না।

মিনিজিও

পরেরদিন যে ভিলেজে গেলাম তার নাম মিনিজিও। পাথরের রাস্তাগুলি কিছু কিছু জায়গায় কাশীর গলির মতনই সরু, তফাৎ শুধু এই যে দুধারের বাড়িগুলি ফুলে ফুলে ঢাকা পড়ে গেছে এবং কিছু ঝরা ফুল ছাড়া রাস্তাঘাটে একটা নোংরা কাগজও চোখে পড়ল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মুসোলিনি এই মিনাজিওতেই বহুদিন গা ঢাকা দিয়েছিলেন। এখান থেকে আমরা লঞ্চে চড়ে গেলাম লেনো নামে একটি ভিলেজে। এই তল্লাটের রেনফরেস্টে ঢোকার সৌভাগ্য হল এখানে। পাহাড়ের ওপর ঘন জঙ্গলের মধ্যে কিছুক্ষণ হাঁটার পরই ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি পকেট থেকে একটি শকিং পিংক চিনে পঞ্চো বার করে গায়ে গলিয়ে নিলাম। চতুর্দিকে দামি দামি ছাতা ও বর্ষাতির মধ্যে আমার এই দারুণ গোলাপি পঞ্চোটি যে কিছুটা বৈচিত্র্য এনেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, খেয়াল করলাম অনেকেই একটু টেরিয়ে টেরিয়ে আমাকে দেখছে। বৃষ্টি থামতেই সেটিকে তাড়াতাড়ি খুলে একটু ঝাড়া দিতেই চীনে পঞ্চোর পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটে গেল। অবশেষে রেনফরেস্ট পেরিয়ে যখন ভিলার কাছে এসে পৌঁছলাম, দেখি সামনে বড় বড় করে লেখা 'নো অ্যাকসেসো' - ওখানে নাকি সিনেমার স্যুটিং চলছে।

পরেরদিনের গন্তব্য ট্রেমেজো ভিলেজে আর সেখানে একটি ভিলার সাইজ এবং বাইরে থেকেই সৌন্দর্য দেখে বেশ মুগ্ধ হয়ে গেলাম - নাম 'শারলটা ভিলা'। আঠারোশো তিরানব্বই সালে প্রাশিয়ার রানি এই সতের একরের বোটানিকাল গার্ডেন সমেত ভিলাটি তাঁর কন্যাকে বিয়ের যৌতুক হিসেবে দিয়েছিলেন। এখন এটি ইতালিয়ান গভর্নমেন্টের নিয়ন্ত্রণে, অর্থাৎ রানির বংশধরদের এখন আমারই মতো টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকতে হয়। ভিলার সবথেকে বড় আকর্ষণ অসাধারণ বোটানিকাল গার্ডেন - সেখানে অজস্র নাম না-জানা ফুলের সমারোহ। লেকের ধারেই বড় বড় স্ট্যাচু আর ফোয়ারা। লেক, স্ট্যাচু, ফোয়ারা ও বাগান সমেত ভিলাটি নিঃসন্দেহে রানির জন্যই উপযুক্ত।

প্রতিদিন রাতে ফিরে এসে মার্কো ও তার বউ-এর সাথে বেশ জমিয়ে গল্প হত। দু-একদিনের মধ্যেই আমরা এতটাই বন্ধু হয়ে গেলাম যে তারা নিজেদের রান্নাঘর থেকে ভাল ভাল ইতালিয়ান ডেলিকেসি আমাদের খাওয়াতে শুরু করল। একবার খেলাম কাঁচা পাতলা করে কাটা হ্যাম আর মোজারেলা চীজ যার নাম 'প্রসুতো'। কাঁচা মাংস খাওয়া আমার একেবারেই অভ্যেস নেই তবুও ওদের আগ্রহে হাসি হাসি মুখে কোনও রকমে গলাধঃকরণ করে 'ডিলিসাস' বললাম। পরে রেস্টুরেন্টে গিয়ে জেনেছি ওরা আমাদের খুব দামি খাবারই খাইয়েছিল কিন্তু একেবারেই অপাত্রে দান অর্থাৎ সাহেবকে সুক্তো খেতে দেবার দশা! দ্বিতীয়টা অবশ্য খুবই ভাল খেতে। বাইরেটা বেশ মুচমুচে আর ভেতরে মিষ্টি দেওয়া চীজ যার নাম 'স্কোলিয়া তেলে'।

লেকের ধারে হোটেল

পরেরদিন মার্কো ও সোফিয়ার উৎসাহে গেলাম ভেরেনা বলে একটি ভিলেজে - বেলাজিওর মতো অত দামি দোকানপাটের চাকচিক্য না থাকলেও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে বেলাজিওকেও ছাড়িয়ে যায়। সেই রাতে ওরা দুজনেই আমাদের বলল ওদের ভারতবর্ষে যাওয়ার খুব ইচ্ছা আছে - মিলানে প্রচুর বলিউডি সিনেমা দেখেছে। হিন্দি সিনেমা দেখে ওদের ধারণা হয়েছে ভারতে নারীপুরুষ নির্বিশেষে সবাই সুযোগ পেলেই রাস্তায় নাচে। রাস্তাঘাটে সারাক্ষণই গরু, শুয়োর, বাঁদর ও গেরুয়া বসনপরা সন্ন্যাসীরা ঘুরে বেড়ায় - এক কথায় খুব 'ফ্যাসিনেটিং' জায়গা। আমি তাদের ভুল ধারণা কিঞ্চিৎ সংশোধন করে দিলাম।

চারদিন পর সোফিয়ার কাছে বিদায় নিয়ে স্টেশনে যাওয়ার জন্য পা বাড়ালাম। মার্কো কিছুতেই আমাদের হেঁটে স্টেশন যেতে দিল না, তার ছোট্ট গাড়িটা নিয়ে আমাদের পৌঁছে দিল।

পথ চলতে গিয়ে মার্কো আর সোফিয়ার মতো কতরকম মানুষের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। তাদের কাছে স্থানীয় জায়গার গল্প শুনেছি। পথের আলাপ অনেক সময় পথেই শেষ হয়ে গেছে তবু কখনও সীমিত সময়ের ট্যুরপ্যাকেজে দৌড়াতে মন চায়নি। মনে পড়ে রাস্তায় আলাপ ইন্দোনেশিয়ার সেই অল্পবয়সী ছেলেটির কথা যার একমাত্র স্বপ্ন সে হিন্দু তাই জীবনে একবার মা গঙ্গাকে দর্শন করবে, সেই জন্য কত কষ্ট করে ভারতবর্ষে আসার টাকা জমাচ্ছে, মনে আসে বাঁকুড়ার ট্রেনের সেই উদাস বাউলের কথা যার গান শুনে মুগ্ধ হয়ে গন্তব্যস্থলে না নেমে বন্ধুরা মিলে পিছুপিছু তার বাড়ি গিয়ে হাজির হয়েছিলাম। আজও ভুলিনি ভরতপুরের জঙ্গলে সেই সাধুবাবার কথা যিনি শিব মন্দিরের লাগোয়া তাঁর ছোট্ট মাটির ঘরে আমাদের নিয়ে গিয়েছিলেন। সম্পত্তি বলতে কম্বল, একটি উনুন, কড়াই, অ্যালুমিনিয়ামের থালা আর একটি ছোট ঘটি। এইভাবেই তিনি পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে এই নিবান্দাপুরিতে একাই বাস করছেন। সেদিন ওঁর নিজস্ব কত জঙ্গলের অভিজ্ঞতার কথা শুনেছিলাম। অত দূরের স্মৃতি রোমন্থনেরই বা দরকার কি? ইতালির এই ট্রিপেও যখন দিন তিনেকের জন্য রোমে থেমেছিলাম তখনকার একটি ঘটনার কথা বলি।

রোদের তাপে কিছুটা ক্লান্ত হয়ে যখন রোমের বিখ্যাত স্কোয়ার 'পিয়াজা ডেল্ পোপোল'-এ বসে ফোয়ারা থেকে জল নিয়ে মুখে চোখে ছেটাচ্ছি, কোথা থেকে একদল বাংলাদেশি হকার রোদের তাপ থেকে আমাদের বাঁচানোর জন্য ছাতা, গগলস্ আর ঠাণ্ডা জলের বোতল নিয়ে ধেয়ে এল। নাঃ আমাদের বয়স দেখে এখন আর কেউ গোলাপ ফুল বিক্রি করতে আসে না শুধু ঠাণ্ডা জলই আনে! দেখলাম একজনের টিশার্টে বড় বড় করে বাংলায় লেখা 'বাড়ি নাই, গাড়ি নাই, স্টেটস্'। তার সঙ্গে একটু গল্প জুড়তেই কোথা থেকে এক খাঁটি ইতালিয়ান গ্ল্যাডিয়েটরের বেশে কোমর থেকে একটি প্লাস্টিকের ছোরা বার করে বাংলায় গান শুরু করে দিল। আমি তো তাজ্জব! 'পরাণ' এবং 'জ্বলিয়া', এই দুটি শব্দই বুঝতে পেরেছিলাম। পরে জানলাম সে তার বাংলাদেশি হকার বন্ধুদের কাছ থেকে দু-এক লাইন করে কয়েকটি বাংলা গান শিখে নিয়েছে। আমাকে ওদের ভাষায় কথা বলতে দেখে তাক্ লাগানোর জন্য গানটি গেয়েছিল। হায়! দুহাজার বছর পরে খোদ রোমে বসে খাঁটি রোমানের মুখে বাংলা গান শোনা যাবে তা বোধহয় জ্যুলিয়াস সীজার অতিবড় দুঃস্বপ্নতেও কল্পনা করেননি। সীজারকে অনেক কষ্টে বহু লোকক্ষয় করে 'ভিনি, ভিডি, ভিসি' বলতে বলতে রাজ্য জয় করতে হয়েছিল আর আজ বাংলাদেশি হকাররা সম্পূর্ণ অহিংসভাবে বিনা ঢাল-তলোয়ারেই একের পর এক ইউরোপীয় শহরগুলি দখল করে নিচ্ছে। তাদেরকে দাবায়ে রাখে কার সাধ্যি!

এই রাস্তাতেই কতরকম মানুষজনের সঙ্গেই যে আলাপ হয়েছে - সত্যি বলতে কী শুধু তাদের নিয়েই একটা গল্প লেখা যায়। তাই আমার কাছে বেড়ানোটা শুধু দর্শনীয় স্থানগুলি দেখাই নয়, তার আশেপাশের মানুষগুলির দিকেও একটু তাকিয়ে দেখা। রোমে এবারেও যখন 'লারগো আর্জেন্টিনার' ধ্বংসাবশেষের সামনে বসে ছুরির ঘায়ে লুটিয়ে পড়া জ্যুলিয়াস সীজারের সেই অন্তিম সময়টির কথা চিন্তা করছিলাম, বারবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ভাবতে হয়নি কখন ট্যুর অপারেটর এসে বলবে "ইওর টাইম ইজ আপ"। জীবনের অন্তিমে সে ডাকে সাড়া দিয়ে তো চলে যেতেই হবে, তবে আগে থাকতেই এত তাড়া কেন?

সোরেন্তোর পথে

লেক কোমো থেকে আরও কয়েকটি জায়গা ঘুরে নেপলস শহরে এসে পৌঁছলাম। আমাদের গন্তব্যস্থল ছিল এখান থেকে ঘন্টাখানেক দূরে 'সোরেন্তো' বলে একটি জায়গা। সোরেন্তো যাবার পথে আমাদের বাস দু-হাজার বছরের পুরনো 'পম্পেই' নগরীতে এসে দাঁড়াল। ভিসুভিয়াসের অগ্নুৎপাতে উনআশি খ্রীষ্টাব্দে এই বিলাসবহুল নগরীটিতে প্রায় কুড়ি হাজার লোক প্রাণ হারায়। তার সতেরোশো বছর পরে প্রত্নতত্ত্ববিদরা মাটি খুঁড়ে এটিকে পুনরুদ্ধার করেন। সুন্দর একটি একতলা ভিলা চোখে পড়ল যার সামনে ফোয়ারা, স্ট্যাচু এমনকী দরজার মুখে একটি চেনে বাঁধা মোজাইকের কুকুর। চব্বিশ অগষ্টের সেই দিনটি আর পাঁচটা সাধারণ দিনের মতনই শুরু হয়েছিল। লোকজন বাজার দোকান করছিল। একটি বাড়ির টেবিলে কিছু ডিম ও দুহাজার বছরের পুরনো কিছু রুটি রাখা আছে। এরা মারা যাওয়ার কয়েক ঘন্টা আগেও পাহাড়ের গায়ে ধোঁয়া দেখে গ্রাহ্য করেনি, স্মরণগ্রাহ্য কালের মধ্যে অগ্নুৎপাত হয়নি ভিসুভিয়াসে - আগ্নেয়গিরি কথাটাই ওদের জানা ছিলনা। ফুটন্ত ছাইগুলো মানুষের গায়ের ওপর জমা হয়ে ধীরে ধীরে শক্ত ইঁটের মত হয়ে যায়। বেশ কয়েকজন টাকার থলি নিয়ে পালাচ্ছিল, তারা সেই অবস্থাতেই পড়ে আছে, আজও তাদের চোখ মুখের আতঙ্ক পরিস্কার বোঝা যায়। অধিকাংশই মারা যায় ধোঁয়া আর ছাই-এ দমবন্ধ হয়ে।

পম্পেই ছাড়ার পর আমাদের বাস পাহাড় ও সমুদ্রের ধার ঘেঁষে সরু, বেঁকানো রাস্তা দিয়ে চলতে শুরু করল। সমুদ্রের ধারে বড় বড় কালো পাথরের ওপর নরনারী নির্বিশেষে সবাই যৎসামান্য পোষাক পরে রোদে বেগুনপোড়া হচ্ছে। অন্যদিকে পাহাড়ের পাদদেশে অসংখ্য লেবু গাছে শয়ে শয়ে হলুদ লেবু ঝুলছে। পৌঁছে আমাদের ভিলাটিতেও দেখলাম চতুর্দিকে লেমন্ গাছ। পরে জেনেছিলাম এই লেবু থেকেই তাদের বিখ্যাত ড্রিংক 'লেমোন সেল' তৈরি হয়। রাত্রে সোরন্তোর মেন স্কোয়ারে গিয়ে দেখি ঠিক যেন রথের মেলা বসেছে। রেস্তোঁরার সামনে গানবাজনা হচ্ছে, কেউ তালে তালে নাচছে আর কেউবা ঘোড়ার গাড়িতে চেপে চতুর্দিক পর্যবেক্ষণ করছে। চারদিকেই রকমারি জিনিসের সঙ্গে হলুদ বোতলে লেমন মেশানো ড্রিঙ্কস বিক্রি হচ্ছে। এক কথায় সবাই বেশ ফুর্তির মুডেই আছে। চিনি, অ্যালকোহল ও লেবুর খোসা দিয়ে তৈরি একটা বড়সড় লেমন সেলোর বোতল কিনে নিলাম ভিলাতে গিয়ে উপভোগ করব বলে। ইতালিতে সবাই ডিনারে রেস্তোঁরায় জলের বদলে ওয়াইন পান করে, আমিও 'যস্মিন দেশে যদাচার'-এর মত একদিন তাদের সঙ্গে দিব্যি তালে তাল মিলিয়ে চলছিলাম। লেমন সেলো গলায় ঢালতে মনে হল ঠিক যেন আমার স্বর্গতা ঠাকুমার হাতের তৈরি লেবু-মিছরির সরবৎ। ভুলে গিয়েছিলাম আমার ঠাকুমা আর যাইহোক লেবুর সরবতে অ্যালকোহল ঢালতেন না। স্মৃতিবিভোর হয়ে বেশ কিছুটা খাওয়ার পর মাথা যখন বোঁ-বোঁ করে ঘুরতে আরম্ভ করল তখন আর কোনওরকম উচ্চবাচ্য না করে সে রাত্রের মত বিছানার আশ্রয় নিলাম।

পরের দিন বাসে চেপে টিরেনিয়ান সীর ধার ধরে পেসিতানো ও আমলফির দিকে রওনা হলাম। একদিকে খাড়া পাহাড় আর অন্যদিকে নীল সমুদ্র, মাঝে মধ্যেই ভয় লাগছিল ওই রাস্তায় বাস ড্রাইভারের হাত একটু নড়ে গেলেই সমুদ্রের কোন অংশে যে গতি হবে তার ঠিক নেই। বাসে উঠেই সকলে ড্রাইভার থেকে আরম্ভ করে আশপাশের সবাইকে 'বোনজোরনো' বলে সম্ভাষণ জানাচ্ছে - ইতালিয়ান ভাষায় গুডমর্ণিং। আমরা পোসিতানো বলে একটি জায়গায় নেমে গেলাম। এ তল্লাটে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পাশাপাশি আর একটি বিষয় খেয়াল করলাম নারী পুরুষ সবাই বড় সুন্দর দেখতে। পাহাড়ি রাস্তায় ওঠানামা করার জন্য কীনা জানিনা কারও শরীরে এতটুকু মেদ নেই। ঝাঁকড়া চুলে ব্লু জিনস্ আর চোখে গগলস্ পরে দাঁড়িয়ে থাকা পুরুষেরা আহা যেন প্রত্যেকেই এক একটি 'ক্যাসানোভা'।

পোসিতানোতে কিছুক্ষণ কাটিয়ে রওনা দিলাম আমালফির দিকে। এখানে রোমান সম্রাটরা ছুটি কাটাতে আসতেন। সম্রাট টেবেরিয়াসের বিরাট ভিলা ছিল এখানে - রোমে রাজত্ব করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গেলে এই সুন্দর জায়গাগুলিতে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচতেন। এখান থেকে আরও কিছুটা দূরে রেভেল ভিলেজ যেখানে হামফ্রি বোগার্ট কয়েকটা ছবির স্যুটিং করতে এসেছিলেন। এখানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সঙ্গে মিশেছে মানুষের হাতে তৈরি তা সাজিয়ে রাখার চাকচিক্য। এইসব দেখতে দেখতে নিজের দেশের কথা ভেবে মনটা খারাপই লাগছিল। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের তো কোন অভাব নেই ভারতবর্ষে, বরং অনেক স্থানই বিদেশের যেকোন জায়গাকে হার মানাবে। যেটা নেই তা হল আমাদের সৌন্দর্যবোধ। সুন্দর জায়গায় আবর্জনা ফেলে আর যত্রতত্র পথের ধারকে পাবলিক টয়লেট বানিয়ে কুৎসিত করে তুলেছি আমরাই।

রাভেলো থেকে দেখা আমলফি

আমাদের এই অন্যরকম ইতালির শেষ গন্তব্য ছিল 'লাম্পেজিয়া'। এই জায়গাটিকে কেন্দ্র করেই আমাদের 'পোর্তোফিনো' ও 'চিংকেটেরে' যাবার প্ল্যান ছিল। চিংকে মানে পাঁচ আর টেরে হল গ্রাম। ভূমধ্যসাগরের ধারে পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে ট্রেকিং করা যায়। এই লাম্পেজিয়ার মত ছোট জায়গাতেও যে এত বাংলাদেশি হকার দেখব তা স্বপ্নেও ভাবি নি। একটি পাকিস্তানি কাবাবের দোকানে দেখলাম শাহরুখ খানের সিনেমা দেখানো হচ্ছে আর তার পাশেই একটি ক্যালেন্ডারে বিশাল ঐশ্বর্য্য রাই-এর ছবি। কাবাবের সঙ্গে সামোসা গোলাপজামুনও সেখানে বিদ্যমান! অদূরেই দেখলাম একজন বাংলাদেশি গেরুয়া বসন পরে সাধুর বেশে ত্রিশঙ্কু হয়ে শূন্যে ঝুলে রয়েছেন, অবশ্য যোগবলে নয়, কোন ম্যাজিকের সাহায্য নিয়ে। পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে বুঝলাম ইনি ইতালিতে একেবারেই নবাগত, এখনও স্থানীয় ভাষা রপ্ত করতে পারেন নি তাই আপাতত চোখ বুঁজে মৌনব্রত অবলম্বন করে ধ্যানে মগ্ন রয়েছেন - একবার ভাষাটা কব্জা করে নিতে পারলেই অন্যান্য হকারদের মত মাঠে নেমে যাবেন। পা টিপে টিপে কাছে গিয়ে যেই ছবি তুলতে গেছি অমনি সাধুবাবা চোখ মেলে বললেন "ট্যু ইউরো", অর্থাৎ তার ভাসমান ছবি তুলতে গেলে প্রতিবার তার শ্রীচরণে দুই ইউরো করে দক্ষিণা দিতে হবে। নাঃ, এই যোগী পুরুষের ধ্যান ভাঙাতে কোনও সুন্দরী অপ্সরার সাহায্য লাগে না ক্যামেরার একটি ক্লিক শব্দই যথেষ্ট!

হোটেল খুঁজতে অসুবিধা হচ্ছিল বলে আর একজন বাংলাদেশি হকারকে হোটেলের নাম্বারটা দিয়ে সেলফোনে ডিরেকশনটা জেনে নিতে বললাম। জাহাঙ্গীর ও তার বন্ধুরা ইতালিয়ান থেকে বাংলায় অনুবাদ করে হোটেলে যাওয়ার রাস্তাটি বেশ সুন্দর বুঝিয়ে দিল। তাদের অনেকেই দুঃখ করে জানাল চিনা জিনিসে বাজার ছেয়ে যাওয়াতে ইতালিয়ান কোম্পানীগুলি সব লালবাতি জ্বেলেছে। অত দাম দিয়ে কেউ আর ইতালিয়ান লেদার বা সিল্ক কেনে না সে কারণে ইতালির লোকজনের অবস্থা এখন যথেষ্ট খারাপ। এখন তারা সামান্য ফুটপাথের জিনিসও এই হকারদের কাছ থেকে অত্যন্ত দরদাম করে কেনে সেটা নাকি আগে আদৌ তাদের স্বভাবে ছিল না। আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললাম চিনেদের জন্য সারা পৃথিবীরই একই দুরবস্থা, এমনকী আমেরিকারও তাদের হাত থেকে রেহাই নেই। ভারতবর্ষেও এখন বেনারসী শাড়ি থেকে মা লক্ষীর পট - সব চিন থেকেই আসে। ভয় হয় কোনদিন দেখব কুমারটুলিকে লাটে

উঠিয়ে খাঁদা নাকে শয়ে শয়ে মা দুর্গা ছেলেপুলের হাত ধরে সোজা চিনের ফ্যাকট্রি থেকে কলকাতায় এসে হাজির হচ্ছেন।
জাহাঙ্গীরকে বললাম "তোমরা হকারি না করে বরং শুধু বাঙালিদের জন্য একটা ইউরোপ ভ্রমণ এজেন্সি খোল। ইউরোপের চতুর্দিকেই তো দেখলাম, তোমাদের বাংলাদেশি দোকান যেখানে ইলিশ-পাবদা থেকে ল্যাংড়া আম সবই পাওয়া যায়। অনেক বাঙালিই মাছ-ভাত ছাড়া বেশিদিন থাকতে পারে না আর স্থানীয় ভাষা বোঝে না বলে একা একা আসতে ঠিক ভরসা পায় না। তোমরা পাশে থাকলে তাদের খাওয়া থেকে ভাষা কোনও সমস্যাতেই পড়তে হয় না। তবে ভুলেও মাছভাত খেতে খেতে ইতালি ভ্রমণের বিজ্ঞাপন দিও না, তাহলে কোন লোক পাবে না। এখন ফিউশন্-এর যুগ তাই বিজ্ঞাপনও সেইমত হওয়া চাই। যেমন ধর 'পাবদা থেকে পাস্তা' বা 'পাস্তা পোস্তর মিলনযাত্রা' তাহলেই দেখবে শয়ে শয়ে কলকাতার বাঙালি ইতালি আসার জন্য লাইন দিয়েছে। জাহাঙ্গীর অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়ে বলল তার খালাতো ভাই কলকাতার ইকবালপুরে থাকে পরের দিনই সে এই ব্যাপারে তার সঙ্গে কথা বলে দেখবে। ওদের ধন্যবাদ জানিয়ে সে রাতের মত পাকিস্তানি দোকানের কাবাব ও গুলাবজামুন খেয়ে হোটেলের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম।

মনটেরোসো

পরের দিন ট্রেনে চেপে চিংকেটেরের পাঁচটি গ্রামের মধ্যে একটিতে গিয়ে উপস্থিত হলাম যার নাম 'মনটেরোসো'। এখানে ভূমধ্যসাগরের ধারে পাহাড়গুলো অনেকজায়গাতেই একেবারে দেওয়ালের মত খাড়া, আদৌ ঢেউ খেলানো নয়। মনটেরোসো থেকে ভারনাজা গ্রাম পর্যন্ত আমাদের ট্রেকিং-এর পরিকল্পনা ছিল। পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে সরু সরু তিনশোটা সিঁড়ি বেয়ে ওঠার পর মনে হল 'ছেড়ে দেমা কেঁদে বাঁচি'। পাহাড়ের গায়ে লেবু ও আঙুরের ক্ষেত আর তার নীচেই গাঢ় নীল রং-এর ভূমধ্যসাগর। রাস্তা এতটাই সরু যে উল্টোদিক থেকে কেউ এলে অনেকসময় দাঁড়িয়ে যেতে হয়, তাছাড়া পা হড়কালেও সমূহ বিপদ। যেতে যেতে প্রচুর জাপানি, আমেরিকান ও ইউরোপীয়ান ট্যুরিষ্টদের দর্শন মিলল। অনেকেই অবশ্য আমারই মত কিঞ্চিৎ চওড়া রাস্তা দেখলেই তার পাশে বসে হাপরের মত হাঁপিয়ে যাচ্ছেন। হঠাৎ খেয়াল করলাম আমার কর্তামশাই লাঠি হাতে একাই যুধিষ্ঠিরের মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রার মত এগিয়ে চলেছেন, পেছনের সঙ্গীরা কে রইল বা কে পড়ে গেল সেদিকে কোনও খেয়ালই নেই! পথে বহুবার থামতে থামতে এবং হাঁপাতে হাঁপাতে অবশেষে যখন ভেরনাজাতে পৌঁছলাম, দেখি রাস্তার ধারে একজন বেহালা বাজাচ্ছে - যেন সশরীরে স্বর্গে আসতে পারার জন্য অভ্যর্থনা!
লাস্পেজিয়া থেকে দিন দুয়েক পরে লঞ্চে রওনা হলাম পোর্তোফিনোর দিকে। বহুবছর আগে আমার প্রিয় গায়ক 'আন্দ্রেয়া বোচ্চেলির' গলায় 'লাভ ইন পোর্তোফিনো' গানটি শুনে গায়ক এবং জায়গা দুটোরই প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম কিন্তু দুঃখের বিষয় যতবারই পোর্তোফিনো যাবার প্রস্তাব করেছি ততবারই ঘরের মানুষটির কাছে শুনতে হয়েছে "যেখানে ইংল্যান্ডের রানি কী এলিজাবেথ টেলরের মত লোকজন ছুটি কাটাতে যায় সেখানে তুমি গিয়ে কী করবে"? আরে বাবা নাই বা হলাম লিজ টেলর, তাই বলে কি একবার 'পোর্তোফিনো' যেতে পারব না? কুঁজোরও তো এক আধবার চিৎ হয়ে শোবার ইচ্ছা হয়। তাই এবার 'কার হেন সাধ্য যে রোধে তার গতির' মত সোজা পোর্তোফিনোতে গিয়ে হাজির হলাম। এখানে গ্রেটা গার্বো, সফিয়া লরেন, লিজ টেলর ও রিচার্ড বার্টনের মতো মানুষেরা ছুটি কাটাতে আসতেন, ম্যাডোনা তার পঞ্চাশ বছরের জন্মদিন পালন করতে এখানেই এসেছিলেন। নেমেই শুনলাম স্টিভেন স্পিলবার্গ ও রিহানাকে নাকি লোকজন ঘুরতে দেখেছে। আমার বরাৎ খারাপ তাই কারুর সঙ্গেই মোলাকাৎ হয়নি। সমুদ্রের ধারে এই জায়গাটি নিঃসন্দেহে খুবই সুন্দর, তবে এর থেকেও সুন্দর জায়গা ইতালিতে আছে - তফাৎ একটাই গ্ল্যামার বা চাকচিক্যে।
হোটেলগুলিকেও পাহাড়ের ধাপে ধাপে এমনভাবে ফুল দিয়ে সাজিয়ে রেখেছে, যাকে বলে একেবারে পারফেক্ট। বেন্টলি বা লমবারগিনি যে দামি গাড়ি সেটাই প্রায় ভুলতে বসেছিলাম। বাইরের কেউ এখানে গাড়ি ভাড়া করে ঘুরতে পারে না, এটাই নিয়ম। শেষ লঞ্চটিও ছাড়ে বিকেল চারটেয় যাতে আমার মতো আমজনতারা তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে পারে। ব্যুটিকের দোকানে জামাকাপড় থেকে জিনিসপত্র সবারই গগনছোঁয়া দাম। লঞ্চে একটি ছোট্ট পিৎজা পঁচিশ ইউরো দিয়ে কিনে খেতে খেতে মনে হল পেটে গিয়ে হজম হলে হয়! হোটেলগুলো যা দামি, দেখে মনে হয় সবাই যেন এক একটি সুন্দরবনের বাঘ। দূর থেকে এক ঝলক দেখেই সাধ মেটানো ভাল, কাছে গিয়ে শুভদৃষ্টি করতে গেলেই হয় প্রাণে নয় ধনে মারা যাবার সম্ভাবনা। বাইরে থেকে সেগুলো দেখতেও প্রায় রয়েল বেঙ্গল টাইগারের মতনই সুন্দর। ট্যুরিষ্টরা দেখলাম তিনগুণ দাম দিয়েই পোর্তোফিনো লেখা টিশার্ট কিনছে। লাস্পেজিয়াতে ফিরে গিয়ে খেয়াল করলাম দোকানে একই টিশার্ট হাফ দামে বিক্রি হচ্ছে। দামের এত তফাৎ কেন জিজ্ঞাসা করাতে দোকানদার অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলল ,"দিস ইজ লোকাল মার্কেতো, দোজ্ আর ফর স্তুপিডো ত্যুরিস্তো"!
লেখাটা শেষ করার আগে হঠাৎ খেয়াল করলাম বাংলা উচ্চারণের সাথে ইতালিয়ান উচ্চারণের অনেকক্ষেত্রেই বেশ মিল আছে। আমরা বাঙালিরা সারাক্ষণই যেন মুখে রসগোল্লা পুরে দিব্যি গোল গোল উচ্চারণ করি তাই রজনীকান্ত আমাদের কছে হয় রজোনীকান্তো। সেইরকমই ইতালিয়ানদের কাছে মার্ক হয় মার্কো বা অ্যাঞ্জেল হয়ে যায় অ্যাঞ্জেলো। তাই উচ্চারণ ঠিক রেখে এবং অযথা ওকার যোগ করে দেখি শেষ পাতে কিছুটা ইতালিয়ান স্বাদ আনা যায় কিনা। এতক্ষণ ধরে যে ভিন্ন স্বাদের ইতালির কথা লিখলাম সেখানকার লোকজোন নিঃসন্দেহে খুবই মার্জিতো, শিক্ষিতো এবং অতিমাত্রায় অভিজাতো। দুপুরে কিঞ্চিতো ঝিমোন্তো থাকলেও রাত বাড়ার সঙ্গে গান বাজনা ও ওয়াইন সহযোগে তারা হয়ে ওঠেন জীবন্তো, যদিও কখনই মাত্রা ছাড়িয়ে হন না অশান্তো। পাহাড়ি রাস্তায় এরা সারাক্ষণই চলন্তো তাই অত জিলতো খেয়েও শরীর মেদবর্জিতো যাকে ইতালিয়ানোতে বলে একেবারে পারফেকতো। এককথায় পাহাড়, হ্রদ ও নীল সমুদ্রের খাঁজে খাঁজে ফুলে ফলে ঢাকা এই ভিলেজগুলো একেবারে দুর্দান্তো। পড়তে পড়তে আমার বন্ধুরাও বোধ হয় এতক্ষণে ক্লান্তো, তাই আমার এই ভ্রমনকাহিনি আজ এখানেই করলাম সমাপ্তো বা কমপ্লিতো। (পুনশ্চোঃ বানান ভুলগুলো ইচ্ছাকৃতো।)

~ ইতালির আরও ছবি ~

শ্রাবণী ব্যানার্জির জন্ম ও বেড়ে ওঠা কলকাতায়। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সির বাসিন্দা। বাংলা সাহিত্যের পাশাপাশি সঙ্গীত ও ইতিহাস পাঠে জড়িয়ে আছে ভালবাসা। কৌতূহল এবং আনন্দের টানেই গত কুড়ি বছর ধরে সারা বিশ্বের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত করে বেড়াচ্ছেন।

কেমন লাগল : - select -

মত দিয়েছেন :

গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

অন্নপূর্ণা বেস ক্যাম্প ট্রেকিং

স্নেহাদ্রি মেউর

~ ~ অন্নপূর্ণা বেসক্যাম্প ট্রেক রুট ম্যাপ ~ অন্নপূর্ণা বেসক্যাম্প ট্রেকের আরও ছবি ~

২০০৬-এ প্রথম সান্দাকফু ট্রেক করার পর আবার অন্য কোথাও ট্রেকিং করার জন্য মনটা আনচান করছিল। অধীরদা - আমাদের ট্রেক ইকুইপমেন্ট যোগান দেয়, বলল, তোরা অন্নপূর্ণা বেস ক্যাম্প যাচ্ছিস না কেন? বেশ উৎসাহিত হয়ে উঠলাম শুনে। একটা রবিবার মিটিং-ও ঠিক হয়ে গেল। আমরা চারজন -কাঞ্জিলাল (ক্যাপ্টেন) , তমঘ্ন , শুভেন্দু, আমি আর অধীরদা আসবে তার গুরু তুহিনদাকে নিয়ে। মিটিং-এর দিন অধীরদা না এলেও তুহিনদা হাজির। বয়সে প্রবীন হলেও প্রথম দিনেই তিনি আমাদের সঙ্গে বেশ মিশে গেলেন। তুহিনদার অন্নপুর্নার স্লাইড শো দেখলাম -এক কথায় অসাধারণ। কোনো গাইড পোর্টার ছাড়াই কীভাবে ট্রেকটা করা যাবে তার একটা প্রাথমিক ধারণাও পেয়ে গেলাম।
নেপালে ঢোকার দুটি রাস্তা আছে বিহার আর পশ্চিম বাংলা দিয়ে। তুহিনদা পরামর্শ দিলেন, বাংলা দিয়ে যাও ওটাই সুবিধা জনক। নিউ জলপাইগুড়ি থেকে পানিটাঙ্কি (ভারতের সীমানায়) হয়ে কাঁকরভিটা (নেপাল সীমানায়)। ভারতীয় ১০০ টাকা বা তার কম টাকার নোটই নেপালি সরকারি ব্যাঙ্ক এক্সচেঞ্জ করে। আর এ সি সি এ পি (ACCAP) থেকে অনুমতি করাতে হবে এই ট্রেকের জন্য।
মে মাসের শেষের দিকের এক রবিবারে আমরা যাত্রা শুরু করলাম। কামরূপ এক্সপ্রেস ধরে পরেরদিন সকাল ছ'টা নাগাদ নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন-এ পৌঁছলাম। ট্রেকার ধরে কাঁকরভিটা পৌঁছালাম সাতটা নাগাদ ; ভাড়া জন প্রতি ১০০ টাকা। লোকাল একজন গাইড নিলাম, নাম রাজু। এখানেই নেপালি কারেন্সিতে টাকা বদলে নিলাম। সারাদিন একটা হোটেলে কাটিয়ে সন্ধ্যের বাসে পোখরার দিকে রওনা দিলাম।
বিকেল সাড়ে পাঁচটায় বাস ছাড়ল। রাস্তার দুপাশে শুধুই ধুধু প্রান্তর। মাঝে মাঝেই নদীর ওপর ব্রিজ আর নীচে সরু সরু নদী বয়ে চলেছে। রাত্রিবেলা বাস চলেছে পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে। আকাশ ঝক ঝক করছে তারায়, রাস্তা ঝল মল করছে স্ট্রিট ল্যাম্পের আলোতে। ভোরের বেলা ঘুম ঘুম চোখে দেখি আকাশের মুখ ভার। কাঞ্জিলাল বলল "আর কোনো দিন মে মাসে ট্রেক করব না রে পিকু (আমার ডাক নাম)"। সকাল সাতটা নাগাদ পৌঁছলাম পোখরা বাস স্টান্ডে। হোটেলে ফ্রেশ হয়ে বেড়িয়ে পড়লাম ACCAP-পোখরা damside এর উদ্দেশে। ইন্টার সিটি বাসগুলো বড় মারুতি ভ্যানের মত। অনেকক্ষণ হন্যে হয়ে খোঁজার পর অবশেষে ACCAP পেলাম। জন প্রতি ২০০ নেপালি টাকার বিনিময়ে ফটো যুক্ত অনুমতিপত্র হাতে পেলাম। পায়ে হেঁটে শহরটা খানিক ঘুরে গেলাম "ডেভিসফল"। তারপর হোটেলে ফিরে লাঞ্চ সেরে একটা লম্বা ঘুম।
পরের দিন ভোর পাঁচটা নাগাদ হোটেলের উল্টো দিকের বাসস্ট্যান্ড থেকে লোকাল বাস ধরে "ফেদী" পৌঁছলাম। বাসভাড়া ১৫০ নেপালি টাকা। চা বিস্কুট খেয়ে ছ'টায় ট্রেক শুরু হল - ৬০ ডিগ্রি খাড়াই সিঁড়ি ভাঙতে হবে এটাই নাকি এই ট্রেকের মজা অথবা সাজা!

ট্রেক পথে

ফেদী থেকে লোয়ার দেওরালি

দীর্ঘ রাস্তা, চড়াই নাহলে উতরাই, জঙ্গল মাঝে ছোটো বড় গ্রাম আর পুরোটাই পাথুরে সিঁড়ি উঁচু উঁচু স্টেপ - এই সব অতিক্রম করেই আমরা এগিয়ে চলেছি। আকাশ মেঘে ঢাকা, শুধু নৈসর্গিক সৌন্দর্য যা বর্ণনা করে বোঝানো যায় না। অবশ্য রয়েছে জোঁকের আতঙ্কও, যেন এক জোঁকের রাজ্যে অনুপ্রবেশ করেছি, রীতিমত তাড়া করছে থেকে থেকেই। এই ভাবেই জঙ্গল নদী পাহাড় পর্বত পেরিয়ে ঘন্টা পাঁচেক হাঁটার পর অবশেষে দেওরালি দেখা গেল। মাত্র দুটি ট্রেকার্স হাট। কাঠের দোতলায় একটি ঘর পেলাম ১০০ টাকার বিনিময়ে তবে বেশ ছোট আর ভিতরে জোঁকও আছে। ঘরের সামনে পাথরের বাঁধানো উঠোনে চেয়ার টেবিল পাতা। সেখানে বসে গল্প করছি হঠাৎ মেঘ সরে গেল আর ফেওয়া লেক আর পোখরা শহরের কিছুটা অংশ পরিস্কার দেখা গেল - অসাধারণ মুহূর্ত "যেন নাটকের রঙ্গমঞ্চ হতে যবনিকার ধীর গতিতে উত্তোলন"। খাবার বেশ দামী, ভাত ডাল সবজি মিল ১৫০ টাকা প্লেট। ডাইনিংরুমটা খুব সুন্দর, খাদের উপর ঝুলন্ত, চারপাশ কাঁচের জানলা দিয়ে মোড়া আর কেরোসিনের টিমটিমে আলো। রাতের মেনু মোটাচালের ভাত, কালো ডাল (রংটা কালচে হলুদ), লোকাল শাকের সবজি (সবজি স্টিক রোল করা), পাঁপড় আর আচার - কন্টিনেন্টাল রাইস প্লেট মন্দ নয়। সারারাত প্রচণ্ড বৃষ্টি হল, সকালেও আকাশ পরিস্কার হল না। তবে ধৌলাগিরি আর অন্নপূর্ণা পরিস্কার দেখা যাছিল। আমাদের পাশের ঘরে এক ইজরায়েলি মহিলা ছিলেন, ঘরের সিলিং থেকে জোঁক ঝুলছে দেখে আতঙ্কে সারারাত ঘুমোতে পারেননি। আমাদের ঘরেও তাই ছিল কিন্তু খেয়াল করিনি। তবে সকালে ঘুম থেকে উঠে পা থেকে জোঁক ছাড়াতে হয়েছে। তবে এটা আগেরদিনের জোঁকের অভিজ্ঞতার তুলনায় কিছুই না। যাইহোক চা বিস্কুট খেয়ে পরবর্তী গন্তব্য ছমরঙ-এর জন্য আবার পথে বেরিয়ে পড়লাম।

লোয়ার দেওরালি থেকে ঝিনু

সকাল থেকেই মাঝে মাঝেই বৃষ্টি হচ্ছে, রাস্তায় জোঁক একেবারে কেঁচোর মত কিলবিল করছে। একটা কথা আগে বলা হয়নি - ট্রেকটা এত কম উচ্চতা

থেকে শুরু যে তিন দিন শুধু রেন ফরেস্টের মধ্যে দিয়ে পথ। চারদিকে অপুস্পক উদ্ভিদের ছড়াছড়ি, মূলত ফার্ন জাতীয় গাছ খুব বড়বড় যা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যাবেনা । সকাল থেকেই এত সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে পায়ের পেশিতে রীতিমত টান ধরেছে। একটা লোহার ব্রিজ ক্রস করেই রাস্তা প্রায় সমতল হয়ে গেল, সামনেই তোলকা। হালকা টিফিন করে আবার হাঁটা দিলাম। রাস্তা প্রায় সমতল, জনবসতির মধ্য দিয়ে হাঁটা। সামনে অন্নপূর্ণাকে মেঘের আড়াল থেকে আংশিক দেখা যাচ্ছে। প্রায় হঠাৎই রাস্তায় চার জন ট্রেকারের দেখা পেলাম, বাঙালি, হাওড়া শিবপুর থেকে আসছেন। তাঁদের মুখে শুনলাম রাস্তায় এখন অনেক বরফ আছে, অনেকগুলো আইসব্রিজ টপকাতে হবে। এই সব শুনে আমাদের হাঁটার গতি বেড়ে গেল। আকাশ আবার মেঘলা হয়ে আসছে, যখন তখন বৃষ্টি নামতে পারে। ঝিনু থেকে প্রায় ২ কিলোমিটার দূরে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি শুরু হল। বৃষ্টির মধ্যেই চড়াই ভাঙতে শুরু করলাম। শরীর আর বইছেনা, কোনোমতে নিজেদেরকে টানতে টানতে ঝিনুতে নিয়ে গেলাম। এখানেও দু'টি ট্রেকার্স হাট আছে, প্রথমটিতেই আশ্রয় নিলাম। কাঠের দোতলায় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন একটি ঘর পেলাম ২০০ টাকার বিনিময়ে। এখানে একটি হট স্প্রিং আছে ১ কিলোমিটার দূরে, শারীরিক ক্লান্তির জন্য আমরা যেতে পারিনি।

তোলকার কাছে লোহার ব্রিজ

ঝিনু থেকে বাম্বু

ঝিনু থেকে ২০০০ সিঁড়ি চড়লে তবেই ছমরঙ পোঁছনো যাবে। আজ আকাশ পরিস্কার আছে। সকালের দিকে শরীরে এনার্জি থাকে বলে, চড়াই ভাঙতে খুব একটা অসুবিধা হচ্ছে না। ঘন্টা দুয়েক পরে আমরা আপার ছমরঙে উঠে এলাম। সামনে অন্নপূর্ণা আর মচ্ছপুচ্ছ আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে। এখান থেকে অন্নপূর্ণা যাওয়ার বা ফেরার রাস্তা একটাই। ছমরঙ অনেক দিক দিয়েই আসা যায়, যেমন ফেদী থেকে, সাহুলি বাজার দিয়ে অথবা পুন হিল হয়ে। কিছুটা বিশ্রাম নেওয়ার পর নামতে শুরু করলাম লোয়ার ছমরঙের দিকে। ছমরঙ একটা খুব বড় গ্রাম, লোকবসতি, চাষাবাদ, দোকানপাট,স্কুল, বিদ্যুৎ সংযোগ, এমন কী হেলিপ্যাড গ্রাউন্ডও আছে। প্রায় ১০০০ সিঁড়ি ভেঙ্গে নামার পর চোখে পড়ল ছমরঙ নদী। ব্রিজ পেরিয়ে আবার ওঠা সিনুয়া পর্যন্ত। প্রায় ৫০০ সিঁড়ি। সিনুয়া পৌঁছে এনার্জি শেষ, এক পেয়ালা করে গরম চায়ে গলাটা ভিজিয়ে নিলাম। আমাদের আজকের পুরো রাস্তাটা একটা বড় 'M' অক্ষরের মত। আকাশের অবস্থা ভালো নয়, বৃষ্টি পড়ল বলে। তাড়াতাড়ি হাঁটা দিলাম, কিছুটা সিঁড়ি ভেঙে নামার পর রাস্তা প্রায় সমতল। ইতিমধ্যেই টিপ টিপ করে হওয়া বৃষ্টি প্রচণ্ড গর্জন ও বর্ষনের রূপ নিয়েছে। কাক ভেজা হয়ে অবশেষে বাম্বু'তে প্রবেশ করলাম । মাথা গোঁজার জায়গা হল একটি একতলা ঘরে, ঘরের মেঝে আর কোমর পর্যন্ত দেওয়াল পাথরের, ওপরের দিকটা কাঠের। রাতের মেনু ভাত-ডাল-তরকারি। ডিনার টেবিলটা খুব বড়, ওদের পরিবারের সঙ্গে বসেই ডিনার সারা হল। বাঁধাকপির একধরনের সুপ দিয়েছিল, অসাধারণ খেতে।

দেওরালির কাছে আইস ব্রিজ - ভেঙে যাওয়ার ঠিক আগে

বাম্বু থেকে আপার দেওরালি

সকালের দিকটায় রেন ফরেস্টের ভেতর দিয়ে হাঁটলেও কিছু সময় পর থেকে তা হালকা হতে শুরু করে দিল। আজ অনেকগুলো পাহাড়ি ঝরনা টপকাতে হল। কোনটি বেরিয়ে আসছে জঙ্গলের বুক চিরে, আবার কোনটি পাথরের গা বেয়ে। খুব তাড়াতাড়িই হিঙ্কু কেভ পোঁছে গেলাম। গুহাটি আকারে খুব বড়, কিন্তু গুহার মুখ স্থানীয় বাসিন্দারা বন্ধ করে দিয়েছেন। আগে অনেক টুরিস্ট এখানেই রাত্রি বাস করত, গেস্ট হাউস কার্যত পর্যটকহীন থাকত, এটাই গুহার মুখ বন্ধের এক মাত্র কারণ। কিছুদূর যাওয়ার পর প্রথম আইস ব্রিজ দেখা গেল, আমরা ওটা টপকে যাব যাব করছি এমন সময় এক পোর্টার উল্টো দিক থেকে ওটার উপরে চড়ল। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর আবার নামতে শুরু করল। ব্যাপারটা বুঝে ওঠার আগেই আইস ব্রিজ ভেঙ্গে পড়ল নদীতে, প্রচণ্ড শব্দ হল "গুডুম" করে। বুঝলাম অভিজ্ঞতার দাম, তার অভিজ্ঞতাই আজ তার এবং আমাদেরও প্রাণ রক্ষা করল। পাশেই নদীর ওপরে কাঠের গুঁড়ি ফেলা আছে, সেখান দিয়ে আমরা নদীটা টপকালাম। সামনে দেওরালি দেখা যাচ্ছে, আমাদের দুই সদস্য ওপর থেকে হাত নাড়ছে। দেওরালি ঢোকার পর জানতে পারলাম ওরা ওই আইস ব্রিজ টপকেই গিয়েছিল। খুব বড় একটা অঘটনের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে, স্রেফ ভাগ্যের জোরে। ২৮০ টাকার বিনিময়ে একটা ঘর পাওয়া গেল। ঘরের সামনে পাথরের বাঁধান উঠোনে ভলি খেলা চলছে। সামনের পাহাড়গুলো সারিবদ্ধভাবে একই এঙ্গেলে কাত হয়ে আছে, অদ্ভুত গঠন। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই জায়গাটি নিমজ্জিত হল মেঘের মধ্যে, চারিদিক অন্ধকারে ঢাকা পড়ল। আবার একটু পরেই পরিস্কার, চারদিক ঝক ঝক করছে। সামনের পাহাড়গুলোতে বরফ পড়ে সাদা হয়ে গেছে।

আপার দেওরালি থেকে অন্নপূর্ণা বেস ক্যাম্প

পাহাড়ের কোলে দেওরালি

আজকের পথে আর গাছেদের দেখা পাওয়া গেলনা। দুদিকেই খাড়া দেওয়াল উঠে গেছে। অনেক উঁচু থেকে এক জোড়া ঝরনা ঝরে পড়ছে, তাদের জলরাশি হাওয়াতেই বাষ্পীভূত হয়ে যাচ্ছে। চোখের সামনের এক ফালি জায়গা দিয়ে আকাশ আর কিছু নাম না জানা শৃঙ্গ দেখা যাচ্ছে। যত সামনের দিকে যাচ্ছি, দৃষ্টি পথ ততই উন্মুক্ত হচ্ছে। সামনের পাহাড়ের গা বেয়ে গড়িয়ে আসা আইস ব্রিজ আমাদের রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের আগের দিনের চরম অভিজ্ঞতা ব্রিজ টপকানোর বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোনো মতে এক এক করে আমরা ব্রিজ পেরোলাম। এই ভাবে পর পর তিনটি বড় বড় আইস ব্রিজ টপকাতে হল। ছমরঙ নদীটি কখন যে পাথরের নীচ দিয়ে বইতে শুরু করেছে তা বুঝতে পারিনি। ঘন্টা দুই পর মচ্ছপুচ্ছ বেস ক্যাম্পে পৌঁছলাম । সামনে তুষার শৃঙ্গ পিছনে আইস ব্রিজের সারি, ডান দিকে অন্নপূর্ণার রাস্তা চলে গেছে। অন্নপূর্ণার দিকে কিছুটা যাওয়ার পর শুরু হল বরফের রাজত্ব, বেস ক্যাম্প পর্যন্ত পুরো রাস্তাটাই বরফে ঢাকা । চারদিকে চোখ মেলে দেখলাম " সামনে অন্নপূর্ণা পিছনে মচ্ছপুচ্ছ, দুপাশে নাম না জানা অসংখ্য পর্বত-তুষার শৃঙ্গ আর পায়ের নিচে সাদা বরফের চাদর, উন্মুক্ত আকাশে মেঘেরা ভেসে চলেছে, ফেলে আসা পথের কোন অস্তিত্ব আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না কারণ তারা মেঘে ঢাকা পড়েছে - এ যেন মেঘের বুক চিরে স্বর্গের পথে উঠে এসেছি, স্বর্গযাত্রা করছি"। এই মনমুগ্ধকর অপার্থিব দৃশ্য আজ আমাদের জীবনকে সফল করল। বেস ক্যাম্প-এর ডান দিকে রয়েছে সুদূরপ্রসারী অন্নপূর্ণা গ্লেসিয়ার। বেস কাম্পে "ক্লোদিয়ার" স্মৃতিফলককে মোমবাতি জালিয়ে দিলাম। পরের দিন সকালে মেঘমুক্ত আকাশে সূর্যোদয় দেখলাম। প্রথম আলো পড়ল অন্নপূর্ণা ১ এর মাথায়, তারপর অন্নপূর্ণা সাউথ - একেবারে পিওর গোল্ডেন, যেন সোনা দিয়ে বাঁধানো।
এবার ঘরে ফেরার পালা।
ধীরে ধীরে দূরে চলে গেল পাইনের বন, চা বাগান।

অন্নপূর্ণা বেসক্যাম্পে সূর্যোদয়

~ ~ অন্নপূর্ণা বেসক্যাম্প ট্রেক রুট ম্যাপ ~ অন্নপূর্ণা বেসক্যাম্প ট্রেকের আরও ছবি ~

ছেলেবেলা কেটেছিল ঘুরে ঘুরেই - নানা জায়গায় বাসাবদলের কারণে। তাই পরবর্তী জীবনে ভ্রমণই ভুবন হয়ে উঠেছে পেশায় ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার স্নেহাদ্রি মেউরের। ভালোলাগার সুন্দর স্মৃতিগুলি পাথেয় করেই জীবন যুদ্ধে এগিয়ে যেতে চান তিনি। নিয়মিত বেড়াতে বেরিয়েই সেই স্মৃতির ঝুলি ভরে তুলতে চান আরও। এখন সেই ভ্রমণের নেশায় যুক্ত হয়েছে অ্যাডভেঞ্চার আর ফটোগ্রাফি। অনেকদিন পরে পুরোনো ভালোলাগার স্মৃতি হয়ে ওঠে মধুরতর - এই ভেবেই ভ্রমণ কাহিনি লিখতেও কলম ধরেছেন।

ছুটির আড্ডা
বেড়িয়ে এসে আপনার অভিজ্ঞতাগুলো যেমনভাবে শেয়ার করতে চান কাছের মানুষদের সাথে - ঠিক তেমনি করেই সেই কথাগুলো ছোট্ট করে লিখে পাঠিয়ে দিন ছুটির আড্ডায়। ছয় থেকে ছেষট্টি আমরা সবাই এই ছুটির আড্ডার বন্ধু। লেখা ডাকে বা নির্দিষ্ট ফর্মে মেল করে পাঠালেই চলবে। লেখা পাঠাতে কোনরকম অসুবিধা হলে ই-মেল করুন - admin@amaderchhuti.com

বার্সের চিঠি

বর্ণালী রায়

প্রিয় আমাদের ছুটি,

রডোডেনড্রনের কথা প্রথম পেয়েছিলাম রবি ঠাকুরের লেখায়। শুনেছিলাম সেই ফুল নাকি ভারি সুন্দর। কিন্তু কখনও কাছ থেকে দেখা হয়নি। অনেকদিনের সেই ইচ্ছাটাকে পরিতৃপ্ত করতে ব্যাগ গুছিয়ে রওনা দিয়েছিলাম ২০১৩ সালের এপ্রিল মাসে। গন্তব্য পশ্চিম সিকিমের এক প্রান্তিক জনপদ - বার্সে। কেউ কেউ ভার্সেও বলে থাকেন। এশিয়ার অন্যতম একটি রডোডেনড্রন স্যাংচুয়ারি রয়েছে এখানে - এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি থেকে মে মাসের শেষ পর্যন্ত ফুল দেখা যায়।
রাতের দার্জিলিং মেল ধরে রওনা দিলাম শিয়ালদহ থেকে। এক ঘুমে সকাল। মনের ভিতর প্রবল উত্তেজনা। সেই সবুজ পৃথিবীতে কখন পৌঁছব যেখানে আছে রডোডেনড্রন।
সকাল দশটা নাগাদ পৌঁছে গেলাম নিউ জলপাইগুড়ি। এখানে এলে আপনিই মন ভালো হয়ে যায়। কিন্তু এবার মন ভালো হওয়ার বদলে মন খারাপের পালা ছিল। ট্রেনেই শুনেছি সেদিন শিলিগুড়ি বন্ধ। কোনো একটা রাজনৈতিক দল বনধ্ ডেকেছে। মাথায় বজ্রাঘাত! বিকেল চারটের মধ্যে হিলে পৌঁছতে না পারলে বার্সে যেতে পারব না আজ। হিলে থেকে ৫ কিমি হাঁটা পথ। কী করি কী করি ভাবতে ভাবতে মনে পড়ে গেল জোড়থাং যাওয়ার শেয়ার জিপগুলো শিলিগুড়ির পায়েল সিনেমার কাছ থেকে ছাড়ে। কোনো রকমে একটা রিক্সা নিয়ে পায়েল সিনেমা পৌঁছে দেখি সব শুনশান। মনের মধ্যে আশঙ্কা আর মনখারাপ দুই-ই দানা বাঁধছে। স্থানীয় এক জন বললেন তেনজিং নোরগে বাস স্ট্যান্ডে চলে যান। কিছু পেলেও পেতে পারেন। এক রাশ সংশয় নিয়ে আবার ওই রিক্সাটা নিয়েই রওনা দিলাম বাস স্ট্যান্ডের দিকে। পৌঁছে দেখি কয়েকটা মাত্র জিপ দাঁড়িয়ে আছে। এক ছুটে গিয়ে খোঁজ নিয়ে জানলাম একটি জিপই জোড়থাং যাবে। সব সিট ভর্তি শুধু একদম পিছনে দুটো সরু সিট। একবার ভাবলাম এত দূর - ৮৫ কিমি রাস্তা প্রায় ঘন্টা তিনেক পাহাড়ি পথে এমন ভাবে যাব কী করে? কিন্তু ওই এক মুহূর্ত দ্বিধা করেই চট করে উঠে পড়লাম। অবশেষে পৌঁছলাম জোড়থাং। ঝিরঝিরে বৃষ্টি পড়ছে। এত ভালো লাগছে যে যাত্রা পথের যাবতীয় ক্লান্তি ধুয়ে মুছে গেল। দুপুরের খাওয়াটা সেরে নিতে হবে। এদিকে দু'টো বাজে। যত তাড়াতাড়ি হোক বেড়িয়ে পড়তে হবে হিলের উদ্দেশ্যে। মোমো প্যাক করে নিলাম। ছাতা আর নুনের প্যাকেটও কিনে নিলাম। শুনলাম ওখানে বৃষ্টি হচ্ছে।

একটা বোলেরো গাড়ি ভাড়া করে রওনা দিলাম। আমাদের ড্রাইভার গোপাল শর্মা। পথের নৈসর্গিক দৃশ্যে বিভোর হয়ে ভুলেই গেলাম সকালের সব বিড়ম্বনার কথা। গুম্বাদাড়া,সোম্বারিয়া আর কত নাম না জানা ছোট-বড় গ্রাম পেরিয়ে ৪৭ কিমি পথ পেরিয়ে হিলে পৌঁছলাম। পথ খুব বেশি না হলেও খারাপ রাস্তার জন্য প্রায় তিনঘন্টা সময় লাগল। বিকেল পাঁচটা বাজে। ধীরে ধীরে কুয়াশা চারপাশকে ঢেকে দিচ্ছে। গাড়ি আমাদের নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। সামনেই রডোডেনড্রন স্যাংচুয়ারির প্রবেশ পথ। রাতঠিকানা বার্সে। তাই টিকিট কেটে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গন্তব্যের পথে পা বাড়ালাম। আমাদের সাথী গাইড কেলা শেরপা গাছ থেকে ছাল ছিঁড়ে শক্ত দড়ির মত একটা জিনিস তৈরি করে আমাদের মালপত্রগুলো ওর নিজের পিঠে বেঁধে নিল। তারপর নিজের ভাষাতে গান গাইতে গাইতে চলতে লাগল। অচেনা সেই পাহাড়ি গানের সুর আমাদের মুগ্ধ করেছিল। আমাদের যাত্রাপথের সঙ্গী ছিল আরও একজন। একটি সারমেয়। সে-ও আমাদের সঙ্গে পুরো দু'দিন বার্সেতে কাটিয়েছিল। মনে হচ্ছিল সে যেন আমাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়েছে। কেলাকে যত দেখছি তত অবাক হওয়ার পালা। একটা ব্যাপার আমাদের অভিভূত করেছিল - সেটা হল ওর পরিবেশ সচেতনতা। আমাদের মত তথাকথিত শিক্ষিত মানুষ যারা আবর্জনা ফেলে পথ-ঘাট অপরিচ্ছন্ন করি তাদের সব ময়লা ও নিজে হাতে সাফ করতে করতে চলল। লজ্জায় আমরা চুপচাপ ওকে অনুসরণ করতে লাগলাম। কেলা অবিচল চিত্তে গান গাইতে গাইতে ময়লা কুড়াতে কুড়াতে এগোতে লাগল। এই পাঁচ কিমি পথের প্রতিটি বাঁকে লুকিয়ে আছে অপার সৌন্দর্য। বহু পুরনো বড় বড় গাছ গাছালি, ঘন সবুজ এই গহন জঙ্গল যেন কত রহস্যময়। কিছুটা চড়াই কিছুটা উতরাই পেরিয়ে আমরা চলতে লাগলাম। এদিকে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। দ্রুত পা চালাতে লাগলাম। যখন বার্সেতে ফিরলাম তখন ঘড়িতে ৬টা ১০। চারদিক ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন। বেশ ঠাণ্ডা। বার্সে ফরেস্ট ব্যারাকে আমাদের পৌঁছে দিয়ে কেলা চলে গেল।

ফরেস্ট ব্যারাকটি ছিমছাম। বিদ্যুতের সংযোগ নেই। লক্ষ্য করে দেখলাম মোবাইল ফোনে টাওয়ারও নেই। মনে মনে ভীষণ খুশি হলাম। ভাবলাম যাক এই দুটো দিন জাগতিক পৃথিবীর অন্তরালে থাকা যাবে। প্রকৃতির কোলে নিজের সঙ্গে একান্তে থাকার এইতো সুযোগ। এই ফরেস্ট ব্যারাক নামক হোম স্টে-টির দায়িত্বে আছেন যিনি তাঁর নাম পুশাই। তাঁর আন্তরিকতা আর সহযোগিতা ভোলা যায় না। মোমবাতির আলোয় উজ্জ্বল ঘরের ভিতর ঢুকে দেখলাম দুটি সুদৃশ্য বিছানা পাতা আছে। কম্বল,বালিশ সবই মজুত। পৌঁছতেই পুশাই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন আমাদের আপ্যায়নে। গরম জল, চা সব কিছুর ঠিকঠাক যোগানে। ঠিক করলাম তাড়াতাড়ি খেয়ে শুয়ে পড়ব। রাতে সুস্বাদু দেশী মুরগির ঝোল আর রুটি খেয়ে রসনার তৃপ্তি করলাম।
একঘুমে সকাল। ভোর ৬ টা বাজে। আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসে যে দৃশ্য দেখলাম তা কোনোদিন ভুলব না। এক অপূর্ব নৈসর্গিক শোভা চারিদিকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। যত দূরে চোখ যায় পাহাড়গুলি লালে লাল। সবুজ পাতার আড়ালে লালিমার বিচ্ছুরণ। কী অভুতপূর্ব দৃষ্টি নান্দনিকতা তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। আমাদের ব্যারাকের ঠিক পিছনদিকে ছিল মাইলের পর মাইল রডোডেনড্রন গাছ। আর তারই ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে শৈলশ্রেণী। বরফের পাহাড়। তাড়াতাড়ি চা, জলখাবার খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম আশপাশটা দেখব বলে। সঙ্গী হল পুশাই। সে পথ দেখাতে দেখাতে চলল।

আমি দুচোখ ভরে এই প্রান্তিক জনপদটির অনাবিল রূপ অনুভব করছিলাম। যত দূরে চোখ যায় শুধুই লাল ফুল ফুটে আছে। রাস্তাগুলোও ফুলের পাঁপড়িতে ঢাকা। নিজেকে বেশ রানি মনে হচ্ছিল। ভাবতে ভালো লাগছিল অন্য কেউ নয় প্রকৃতি নিজের হাতে তার ভাঁড়ার থেকে একমুঠো সুখ আমার জন্য উজাড় করে দিয়েছে। বার্সেতে ফরেস্ট ব্যারাক ছাড়া আর একটিই থাকার জায়গা আছে - বার্সে গুরাস কুঞ্জ। আমরা লক্ষ্য করছিলাম সেদিন বার্সেতে আমরা ছাড়া আর কোনো পর্যটকই ছিল না। তবে দেখলাম কিছু স্থানীয় লোক একটা জায়গায় তাঁবু খাটাচ্ছে। জিজ্ঞেস করে জানলাম বিকেলে কয়েকজন বিদেশি পর্যটক আসছেন। এখান থেকে সিঙ্গালিলা পর্বত আরোহণের জন্য রওনা দেবেন। গোচালা পর্বতে আরোহণের জন্যও এই বার্সেতেই বেসক্যাম্প করা হয়। জায়গাটার বিষয় যত জানতে পারছি, যত দেখছি আরও ভাল লাগছে। রডোডেনড্রন গাছগুলি যে এত বড় বড় হয়, এত তার বিস্তার, এত গহীন, এত গভীর তার বেড়ে ওঠা আমার জানার অতীত সব তথ্য আজ আমার ঝুলিতে। ওখানে কাছাকাছিই ছিল একটি কৃত্রিম জলাধার। জলাধারের চারপাশে হাজার হাজার লাল লাল রডোডেনড্রন। মনে হচ্ছিল যেন ঈশ্বর নিজের হাতে মানুষের জন্য সাজিয়ে রেখেছেন তার পান্থশালাখানি। বার্সে জিরো পয়েন্ট দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছিল কোথাও যদি স্বর্গ থাকে তবে তা হল এটাই।
এই ভাবেই কেটে গেল আর একটি দিন। পৃথিবী যেন তার সময়ের চাকা কয়েক মুহূর্ত আমার জন্য থামিয়ে দিয়েছিল নিজেকে চিনে নেওয়ার জন্যই। এবার ফেরার পালা। এই মনমোহিনী ধরিত্রীর অপার সৌন্দর্য প্রাণ ভরে উপভোগ করে কেলা আর আমাদের সেই পুরোনো সাথী সারমেয়টির সঙ্গে রওনা দিলাম হিলের উদ্দেশ্যে।
আমার বেড়ানোর আনন্দ আর অভিজ্ঞতার কথা সবার সঙ্গে ভাগ করে নিতে লিখে পাঠালাম। সঙ্গে রইল আমার তোলা কিছু ছবিও। তোমাদের পছন্দ হলে আমারও খুব ভাল লাগবে।
ভালো থেকো সবাই।

~ বার্সের তথ্য ~ বার্সের আরও ছবি ~

শিক্ষাবিজ্ঞানের ছাত্রী বর্ণালী রায় ছোটবেলা থেকেই সৃজনশীল লেখা এবং সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের সাথে যুক্ত। পেশায় হাইস্কুল শিক্ষিকা। অংশ নিয়েছেন কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক দপ্তর আয়োজিত সর্বভারতীয় প্রশিক্ষণ শিবিরে। লেখালিখি ছাড়াও ভ্রমন পিপাসু - বারবার বেড়িয়ে পড়েন প্রকৃতির টানে.বিভিন্ন ধরনের মানুষের সঙ্গে মিশে তাদের মন ও মনন বুঝতে চাওয়াটাই তাঁর নেশা।

কেমন লাগল : - select -
Like One person likes this.
tell a Friend
মত দিয়েছেন : 4
গড় : 3.75

সুন্দরবনের অন্দরে

মনিরুল ইসলাম মল্লিক

গতবছর সুন্দরবন দ্বীপাঞ্চলে পুজো পরিক্রমায় ডাক পেয়ে বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম। খাঁড়িপথে দ্বীপে দ্বীপে প্রতিমা দর্শনের এমন সুযোগ কি আর হাতছাড়া করা যায়? শিয়ালদহ থেকে ট্রেনে মথুরাপুর। সেখান থেকে ম্যাজিক ভ্যানে চেপে রায়দিঘি। এখান থেকেই জলপথে ছোট লঞ্চে চেপে আমাদের যাত্রা শুরু। বেরিয়ে পড়লাম রহস্যময় বাদাবনের জঙ্গলের উদ্দেশে।

কাহিনি শুরুর আগে সুন্দরবন সম্পর্কে কিছু না বলে নিলে যেন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। জীববৈচিত্রে আর সৌন্দর্যে ভরপুর ম্যানগ্রোভ অরণ্যে ঘেরা পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ এই সুন্দরবন। ভারত আর বাংলাদেশ মিলে প্রায় দশ হাজার বর্গ কিলোমিটার এলাকা নিয়ে এর বিস্তৃতি। সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ প্রাচীর বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট বড় বড় সামুদ্রিক ঝড় থেকে আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে। সমুদ্রের কোল ঘেঁষে ছোট-বড় নদী - মিষ্টি আর নোনা জলের মিশ্রণ আর প্রতিনিয়ত তাতে জোয়ার-ভাঁটার খেলা। তারই মাঝে মাঝে জেগে ওঠা চর আর ম্যানগ্রোভ অরণ্যের দ্বীপগুলি। সুন্দরী, গরান, গেওয়া, হেঁতাল ছাড়াও রয়েছে ঝাঁটি, ধানি ঘাস, কাঁকড়া গাছ, চোড়া, কেওড়া, গোলপাতা, ধুঁধুল সহ নানান ধরনের গাছগাছালি। হেঁতাল গাছগুলো অনেকটা খেজুর গাছের মত দেখতে, পাতাগুলো সবুজ-হলুদ। হেঁতাল পাতা আর কাণ্ডের রঙের সঙ্গে বাঘের গায়ের রঙ মিলে যাওয়ায় শিকার ধরার সময় বাঘ এর আড়ালে লুকিয়ে থাকে। নদীপথে যেতে যেতে আমার এই হেঁতাল গাছই সবচেয়ে বেশি চোখ টেনেছিল।

অগ্নিশিখা ফুলের উপর আগুন রঙের প্রজাপতির ছটফটানি স্বাগত জানাল আমাদের। পঞ্চকোট পাহাড়ের রায়দিঘি হয়ে মনি নদী বেয়ে আমার দ্বীপের কাছে পৌঁছলাম। এখানে মানুষের বসতি নেই। তবে জীবিকার সন্ধানে আশেপাশের দ্বীপগুলি থেকে বাসিন্দারা কাঁকড়া ধরতে প্রায়ই এই দ্বীপে হানা দেয়। কয়েকজনকে দেখলাম এক কোমর কাদায় নেমে হাত দুটো পাঁকের মধ্যে ডুবিয়ে কী কৌশলে কাঁকড়া ধরছে। মাছ-কাঁকড়া এসব ধরেই এদের সংসার চলে।

আমার দ্বীপের মত টেমারী দ্বীপেও মানুষের কোনো বসতি নেই। সুন্দরবনে এরকম ছোটখাটো দ্বীপ অনেক আছে যেখানে আদৌ মানুষের বসতি গড়েই ওঠেনি। নদী এখানে দুভাগে ভাগ হয়ে একটা ঠাকুরাইনের দিকে আর অন্যটা পাথরপ্রতিমার দিকে চলে গেছে। আমরা পাথরপ্রতিমার দিকে এগিয়ে চললাম। মাঝে হরিণডাঙায় একবার নেমেছিলাম। এই দ্বীপটিতে একসময় প্রচুর হরিণ ছিল তাই এই নাম হয়েছে। হরিণডাঙা, কেদার, পঞ্চম এইসব দ্বীপাঞ্চলে কয়েকটি পুজো মণ্ডপ ঘুরে সেদিনের মত রাতে রায়দিঘি ফিরে এলাম। রায়দিঘির কাছাকাছি অনেক হোটেল রয়েছে। তবে লঞ্চেই আমাদের থাকার ব্যবস্থা ছিল।

পরদিন আবার নদীপথে বেরিয়ে পড়লাম। দোমকর দ্বীপ, কুয়েমুরি, বনিদ্বীপ হয়ে আমরা বাঘের দ্বীপে এসে পৌঁছলাম। এই দ্বীপটিতে না এলে হয়ত সুন্দরবনের আসল রূপটাই ঠিক বুঝতে পারতাম না। এটাই সুন্দরবনের বিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগারের আবাসস্থল। কেমন একটা গা ছমছমে পরিবেশ। লঞ্চের চালক মাধবদা বলল, বাঘ দেখতে চাইলে চুপচাপ থাকুন, যদিও কমই দেখা যায় - জল খেতে মাঝেমধ্যে নদীর পাড়ে হানা দেয়। আমরাও চুপ। সকলে বড় বড় চোখ করে গভীর জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে আছি। নিস্তব্ধ রোমাঞ্চে ভরা এক মায়াবী পরিবেশ যেন সৃষ্টি হয়েছে চারপাশে। এমন সময় কে যেন বলে উঠল, 'ওই তো বাঘ'। উত্তেজিত হয়ে বাকীরাও এমন চেঁচাল যে বাঘের টিকিটুকুও আর দেখতে পেলাম না।

বাঘের দ্বীপেই রয়েছে বনবিবির মন্দির। প্রতিবছর বৈশাখ মাসের শেষ মঙ্গলবার এই মন্দিরে বনবিবির পুজো হয়। গ্রামবাসীদের বিশ্বাস এদিন নাকি বাঘ কাউকে আক্রমণ করেনা। বিভিন্ন দ্বীপ থেকে শয়ে শয়ে মানুষ এসে এখানে পুজো দেয়। আসলে এই জঙ্গলে কাঠ, মধু সংগ্রহ করতে এসে অনেকেরই আর ঘরে ফেরা হয়না। তাঁদের আত্মার শান্তি কামনায় এই পুজো।

বাঘের দ্বীপের ঠিক বিপরীতে নদীর ওপারে বিধবা পাড়া। জঙ্গলে কাঠ কাটতে গিয়ে বাঘের হাতে স্বামী মারা গেছেন এমন অনেক মহিলাই এখানে বাস করেন। তাই লোকের মুখে মুখে এই নাম। দ্বীপগুলির মধ্যে দিয়ে সরু সরু খাঁড়ি পথে ছোট ছোট নৌকায় এখানকার বাসিন্দারা মাছ, কাঁকড়া আর বনজ সম্পদ আহরণে বের হন। প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে এভাবেই বেঁচে আছেন স্থানীয় মানুষজন। আবার নিয়মিত গাছকাটা আর লোকালয় বেড়ে যাওয়ায় ব্যহত হচ্ছে এই বনাঞ্চলের বাস্তুতন্ত্র, ক্রমশ কমে আসছে বাঘের সংখ্যাও। সুন্দরবনের জীব পরিমণ্ডল রক্ষার জন্য তাই একদিকে বনাঞ্চল এবং বাঘ সংরক্ষণ যেমন অত্যন্ত জরুরি তেমনই দরকার সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা আর জীবনযাত্রার মান্নোনয়ন। সুন্দরবনের অরণ্য, মানুষ, উৎসব সব দেখে ফেরার পথে এই কথাটাই বারবার মনে হচ্ছিল।

~ সুন্দরবনের তথ্য ~ সুন্দরবনের আরও ছবি ~

সাংবাদিক ও আলোকচিত্রী মনিরুল ইসলাম মল্লিক ভালোবাসেন বেড়াতে। বর্তমানে যুক্ত রয়েছেন প্রভাত খবর এবং পথিক ভ্রমণ পত্রিকার সঙ্গে।

কেমন লাগল : - select -

Like One person likes this.

tell a Friend

মত দিয়েছেন : 4

গড় : 3.75

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher